সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
হেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিন্টার্স
৪-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
দাম দু-টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

এই লেখকের অন্যান্য বই
প্রিয় প্রসঙ্গ
বিকিকিনির হাট

বন্ধুবর

শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্যের

করকমলে

ভূমিকা

প্রায় এই রকম একটি ঘটনার কথা আমার শোনা ছিল। সমস্যাটা ছিল শোনা ঘটনার কাঠামোয় রূপারোপ করব কী করে। কেননা একথা তো সকলেই জানেন যে সাহিত্যে সত্যের চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য সত্যের প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার সেই তীব্র রূপকে ধরাটাই আসল প্রশ্ন। সেইজন্যেই এই কাহিনী এবং ভূমিকা উভয়েই আমার নিজের কথার কোন ঠাঁই নেই।

যে ডায়েরিটা আজ আমি আপনাদের কাছে এনে দিচ্ছি সেটা আমার কাছে রয়েছে গত তিন বছর ধরে। অনেকবার ডায়েরিটা আমি পড়েছি। অনেকবার একথা মনে হয়েছে আমার কাছে ডায়েরিটা রাখা আর কোনমতেই সমীচীন হচ্ছে না—কিন্তু সাহারানপুরে মঞ্জুরা আর থাকে না, রূপসাডিহির বাড়ি তো আমার হাত দিয়েই বেচে দেওয়া হল, কাজেই ডায়েরির লেখিকা মঞ্জুর কাছে আর তার এই খাতাখানা পাঠানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল। এখন যদি মঞ্জুর কাছে মঞ্জুর খাতা আমি ফেরত দিতে চাই আমার লজ্জার থেকেও মঞ্জুর লজ্জা বেশি হবে। এ কথা তার বিশ্বাস করার কোন হেতুই নেই যে ডায়েরিখানা হাতে পেয়েও আমি পড়ে দেখিনি।

একটা প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন যে একটা পনের বছরের বাচ্চা মেয়ের ডায়েরি আমি পড়তে গেলাম কেন? সে কথার জবাব দিতে গেলে বলতে হয় কৌতূহল নামক বস্তুটা ভদ্রতার উল্টো পথের পথিক। কাজেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ডায়েরিটা হাতে পাওয়ার পর আমি জাগিয়ে রাখতে পারিনি। আমার সঙ্গে মঞ্জুর বাবা সিতাংশুবাবু আর মঞ্জুর মা অশ্রুর সামান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সেই কারণেই রূপসাডিহির 'অশ্রুনিলয়ে' যে পারিবারিক নাটক উনিশশো পঞ্চান্ন সালে অভিনীত হয়েছিল তার সম্বন্ধে উড়ো উড়ো দু-চারটে খবর পেয়েছিলাম আত্মীয় মহলে পরচর্চার বৈঠকে। ব্যাপারটার আদি অন্ত কি তা জানবার জন্যে আমার মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন সদা সর্বদাই ছিল। ভদ্রতা বড় অদ্ভুত জিনিস। কেননা ভদ্রতায় বেধেছিল সরাসরি রূপসাডিহিতে গিয়ে ব্যাপারটা কি তা দেখে আসতে। ভদ্রতায় বেধেছিল সটান সিতাংশু-বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে কি ব্যাপার মশাই। কিন্তু ভদ্রতা সত্যিই বড় অদ্ভুত জিনিস। যেদিন আমি ডায়েরিটা হাতে পেলাম সেদিন—

কিন্তু তার আগে কিছু কথা আছে। আমি তখন কলকাতায়। সিতাংশুবাবুরা তখন মাসখানেক হল চলে গেছেন সাহারানপুরে। সেদিন সকালের ডাকে একখানা চিঠি এল। ওপরের কোনায় ঠিকানা লেখা 'সাহারানপুর'। নাতিদীর্ঘ চিঠি। ভাষা কাটা কাটা। লেখা আছে "—সুতরাং বাড়িটা বেচেই দোব ঠিক করলাম। ফার্নিচার যা সিফ্ট করা সম্ভব তা আস্তে আস্তে সিফ্ট করার ব্যবস্থা করছি। বাকি ফার্নিচারও বিক্রি করে দেওয়া হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দালালও লাগিয়েছি। খরিদ্দাররা বাড়ি দেখতে আসবে। অন্য দেনা পাওনার ব্যাপারও কিছু আছে। এগুলো না মেটা পর্যন্ত তুমি বাড়িটার দেখাশোনা করো। কটা দিন ওখানেই কাটিয়ে এস। রামবিরিজ আর ঝি সুখদা আছে। তোমার কোন অসুবিধে—"

চিঠিটা পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রূপসাডিহিতে কনট্রাক্টার সিতাংশুবাবুকে সবাই চিনত। তবু সিতাংশুবাবু কলকাতা থেকে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমি সিতাংশুবাবুর দূর সম্পর্কে আত্মীয়—ভেবেছিলাম বুঝি এই কারণেই আমাকে আহ্বান। পরে বুঝেছিলাম—না, সিতাংশুবাবুকে চিনত বটে সবাই কিন্তু সে অন্য ভাবে। যে অবস্থায় রূপসাডিহির সঙ্গে আর অন্য কোন সম্পর্ক রাখা চলে না।

অগত্যা হেমন্তের এক পড়ন্ত বিকেলে ব্রাঞ্চ লাইনের এক ইস্টিশনে নামলাম। ছায়া ছায়া ঘুম ঘুম ইস্টিশন। নাম রূপসাডিহি। জিলা সাঁওতাল পরগনা। অনেকগুলো শাল মহুয়ার গাছ গলা জড়াজড়ি করে ইস্টিশনের ধারে কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জটলার মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে পুবদিকে সোজা ছুট দিয়েছে মেটে রাস্তা। হেমন্তের অবসন্ন বিকালে গাছে গাছে পাখিদের ব্যস্ত কোলাহল। অন্ধকার নামবে কাজেই ত্রস্তও বটে কিছুটা।

সিতাংশুবাবুর বাড়ির নাম অশ্রুনিলয়। স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম অশ্রুনিলয় নামটা সবাই চেনে। টাঙাওয়ালাও বললে—বাড়িটা চেনে সে। হাঁ পহচানতা হায় ওহি মকান্।

প্রায় নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে টাঙার চাকা গড়িয়ে চলল। দু-ধারে বড় বড় বাগানের মাঝখানে পুরনো পুরনো বাড়ি। রূপসাডিহি এতকাল বৎসরান্তিক চেঞ্জারদের কাছেই পরিচিত ছিল—যকৃৎ বিকৃতির আশ্রয়রূপে। সেটা বোঝা যায় দু-ধারের ছোট বড় বাড়িগুলোর নাম দেখে। নামহীন বাড়ি একটাও নেই। ভবন, নীড়, নিকেতন কিছু একটা যুক্ত করে একটা না একটা নাম আছেই। একটু বড় একটু সৌখিন বাড়ি হলেই নামফলকে আর বাংলা নাম নয়, ইংরাজি নাম।

গত ক-বছর ধরে কিন্তু চেঞ্জাররা সবাই ফিরে যাচ্ছে। রূপসাডিহি থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে লক্ষ্মীপুরে লোহার কারখানা বসেছে। পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার তৎপরতা। কাছাকাছি যত গ্রাম রূপসাডিহি, কমলাঝুরি সব এখন বোঝাই হয়ে গেছে নবাগতের ভিড়ে। ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, কনট্রাক্টার, আই, ও, ডবলিউ, চার্জম্যান, ফোরম্যান, বাঙালী, মাদ্রাজী, ইউ-পিওয়ালা, পাঞ্জাবী সবাই সপরিবারে এসে জুটেছে। লক্ষ্মীপুরে এদের জন্যে স্টাফ কলোনি হচ্ছে তৈরি, কিন্তু শেষ হতে দেরি আছে এখনো। ততদিন চেঞ্জাররা ফিরে যাবে। ততদিন রূপসাডিহিতে আর বায়ু পরিবর্তনের জায়গা নেই। কারখানার দিকে এগুতে লাগলাম, আর যেতে যেতে মেটে রাস্তা পিচের হয়ে গেল. বেরিয়ে এল—বিদ্যুৎ, মোটর, লরি, জিপ।

ইউক্যালিপটাসের ভিজে গন্ধ জড়ানো ম্লান হেমন্তের হাওয়ায় মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। এঁকে বেঁকে কখনো গেরুয়া ধুলোর রাস্তার ওপর কখনো পিচের রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে শুনতে, বাড়ি আর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দূরের টিলার ওপর সন্ধ্যা নামছে দেখতে দেখতে আমি চলতে লাগলাম অশ্রুনিলয়ের দিকে। আর দু-মাইল দূরে কারখানা। বেশ শহর শহর ভাব এবার। বিদ্যুৎ-চকিত চনমনে হাফ শহর।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। ম্লান গাছপালার মাথায় মাথায় পাখিদের কিচির মিচির তখন বেড়ে উঠেছে। দুটো কি একটা ব্যস্তবাগীশ তারা আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে সবে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে এই মাত্র। সবে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে পশ্চিম আকাশের বুকে নানারঙের ছোপ। তারপর যখন বেশ অন্ধকার তখন সেই ভর সন্ধ্যেবেলায় মঞ্জুদের বাড়ির মস্ত বড় বাগানের সামনে নামলাম। এদিকে ওদিকে আরো দু-একখানা বাড়িতে বিদ্যুতের আলো, শুধু এ বাড়িটা অন্ধকার। দুটো মস্ত বড় ইউক্যালিপটাসের তলা দিয়ে, একরাশ কামিনীফুলের ঝাড় পেরিয়ে, গন্ধরাজ আর হলিহকের আস্তানাকে পাশ কাটিয়ে, উপেক্ষা করে শুকনো-মুখ গোলাপ কাঁটার কাপড় টান, লাল কাঁকর বিছানো পথে মৃদু সিরসির শব্দ তুলে, কখনো বা মাড়িয়ে দু-একটা শুকনো পাতার কঙ্কাল দরোয়ানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভাঙ ঘোঁটা ছেড়ে দরোয়ান রামবিরিজ সাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল—আইয়ে বাবুজী আইয়ে। রামবিরিজ আমায় চেনে। সিতাংশুবাবুর উত্তরপাড়ার বাড়িতে সে আমায় দেখেছিল দু-বার। আমি যে আসব একথা সিতাংশুবাবু

ওকেও জানিয়েছিলেন। আলো জালিয়ে আমাকে ও দোতলায় নিয়ে গেল।

এটা সিতাংশুবাবুর নিজের বাড়ি। লক্ষ্মীপুরের লোহার কারখানার গোড়া পত্তনের প্রথমদিকেই সিতাংশুবাবু কলকাতার বিজনেস গুটিয়ে কনট্রাক্টরির স্বর্ণখনির সন্ধানে চলে এলেন লক্ষ্মীপুরে। লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চল তাঁকে তাঁর বুদ্ধির জন্যই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। বছর দুয়েকের মধ্যেই সিতাংশুবাবু রূপসাডিহির শেষ সীমায় লক্ষ্মীপুরের ধার ঘেঁষে এই বাগানওয়ালা বাড়িখানা দাঁও বুঝে কিনে ফেললেন। পুরনো ধরনের বাড়ি ভেঙে চুরে নানা ভাবে সাজিয়ে নিলেন। বাড়ির নাম রাখলেন অশ্রুনিলয়। বাড়িখানা ছোটখাট কিন্তু সুন্দর। দেখলাম বাগানটা আরো সুন্দর। তারের ফেন্সিঙের ধারে ধারে পামগাছের সার। কিচেনের পিছনে একঝাড় গোলাপ। এদিকে গিলার্ডিয়া আর সূর্যমুখীর শূন্য শয্যা, ওদিকে চন্দ্রমল্লিকার আসন্ন মরশুম। একটা জামরুল গাছ আর একটা লম্বা দেবদারু। সবটা মিলিয়ে ছবি-ছবি ভাব।

যে ঘরে সুখদা, বাড়ির রাঁধুনি-কাম-ঝি-কাম-গৃহিণীর-সখি আমার থাকার ব্যবস্থা করল সে ঘরের দেওয়ালে একটা মেয়ের ছবি। বছর পনেরোর হাসি হাসি মেয়ে। ছবি, কিন্তু ছবির থেকেও সুন্দর লাগল ছবিটা। ঘরের আসবাব-পত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ঘরখানা যার ছবি তারই ছিল। ভাবলাম এই তাহলে মঞ্জু। সিতাংশুবাবুর মেয়ে। মেয়েটির মুখচোখ মায়ের মতনই সুন্দর। ওই ঘরেই আমি থাকতাম। কাজকর্ম ছিল না। চেয়ে চেয়ে দেখতাম উদাস ইউক্যালিপটাস, দূরের দহিজুড়ির জঙ্গল, বুড়োবুড়ি পাহাড়। ঝিরঝির করত হেমন্তের সিরসির হাওয়া আর খাঁ খাঁ করত শূন্য অশ্রুনিলয়। ভারি মন নিয়ে বড় বাগানখানায় ঘুরে বেড়োতাম। মনে হত অশ্রুনিলয় যেন একটা পরিত্যক্ত রঙ্গমঞ্চ। এর কুশীলবদের কেউ আজ আর এখানে নেই। কিন্তু কী অভিনয় এরা করে গেল এখানে তা আর জানবার কোন উপায় নেই। বোবা বাড়ি একা নিঝুম। সেদিন আকাশ মেঘ মেঘ, দিনটা শীত শীত। ঘরে বসে ছিলুম। কী করি, বসে বসে ভাবছিলুম একখানা বই পেলে মন্দ হত না। মঞ্জুর বইয়ের আলমারির চাবিটা আমার কাছেই ছিল। বইগুলো বার করে সাহারানপুরে মঞ্জুদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। ফার্নিচারের সঙ্গে এ আল-

মারিটাও বিক্রি হবে। ভাবলাম দেখি যদি আলমারিটায় গল্পের বই খুঁজে পাই একখানা। আলমারি খুঁজে পেলাম শরৎচন্দ্রের একটা নভেল আর এই খাতাখানা। খাতাখানা একবার খুলতেই খাতাটার চরিত্র বোঝা গেল। শরৎচন্দ্র পড়ে রইল আমি খাতাখানা নিয়ে পড়লাম। এক মুহূর্তে সমস্ত অশ্রুনিলয় যেন কথা কয়ে উঠল।

কালো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। ভেতরে প্রথম পাতায় লেখা 'মঞ্জুর জন্মদিনে অরুণদা'—তারপর—

১৩ই মে, ১৯৫৫

কাল রাত্রি বারোটায় সব মিটল। আমার জন্মদিন ছিল কাল। জন্মদিনে বাবা দিয়েছেন একছড়া জড়োয়ার নেকলেস, মা দিয়েছেন চমৎকার ব্রোকেডের ফ্রক আর রুণুমামা পাঠিয়েছেন চারখানা বই, বই চারখানা তখনই খুলিনি। আজ খুললাম। একটাও ডিটেকটিভ বই নয়। ফ্রকটা আমার খুব মনোমত হয়েছে। সামনের বার জন্মদিনে মা আর ফ্রক দেবে না বলে দিয়েছে। এবারেই দিচ্ছিল না, পূজোর সময়ে শাড়ি নোব কথা দিয়ে অনেক খোসামোদ করে তবে রাজি করিয়েছি। আমি চোদ্দ পুরে এবার পনেরোয় পা দিলাম। বাড়ন্ত গড়ন বলেই মা বলেছেন ফ্রক পরা আর বেশিদিন হবে না। আমার কিন্তু ফ্রক ছাড়তে একটুও ইচ্ছে করে না। শাড়ি জড়িয়ে দৌড়ান, লাফানো, পেয়ারা গাছে ওঠা কিচ্ছু হয় না। তাহলে কী হবে, মা বলেছেন এই বয়সেই সব মেয়ে ফ্রক ছাড়ে। মায়ের সঙ্গে এক এক সময় আমার একটুও মতে মেলে না। কিন্তু কী করব মায়ের অসুখ হবার পর থেকেই মার কাছে দাঁড়ালেই কেমন কান্না আসে আমার সেই জন্যে কিছু বলতে পারি না।

রাত প্রায় এগারোটায় জন্মদিনের ভিড় ফুরলো। অনেকেই এসেছিলেন। বুড়ো সিংজি, মিঃ তরফদার, মিসেস তরফদার, রমেশকাকু, বারীনমামা, রমেশ-কাকিমা, টুলুমাসি, ইলু, বিল্টু, পলাশ বেশ একটা ভিড় হয়েছিল। বাবা আর রমেশকাকু তরফদারদের যেরকম খাতির করছিল না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের ড্রইংরুমে সবাই বসে বসে বেশ হুল্লোড় করা হল। দাড়ি-ওয়ালা সিংজি বাবার সাব কণ্ট্রাক্টর আমাকে একটা সোনার টোপর পরানো

পার্কার ফিফ্‌টি ওয়ান দিয়েছেন। রমেশকাকু দিয়েছেন শান্তিনিকেতনী কাজ করা একটা ভালো কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ। মিস্টার তরফদার ও মিসেস তরফদার—এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাবার ওপরওয়ালা—দিয়েছেন একটা মস্ত বড় ফুলের তোড়া। মিসেস তরফদার সারা বিকেল বসে ওই তোড়াটি তৈরি করেছেন, ইয়ার্কি নয়, সবাই শুনে 'থ'। সকলে বলল 'আমি কি ফরচুনেট!' মিসেস তরফদার না হেসেও কী রকম হাসাতে পারেন। আমি চেষ্টা করে দেখেছি পারিনে, সত্যি সত্যি হেসে ফেলি। ওয়াদিয়া সায়েব তরফদার সায়েবের ওপরওয়ালার আসার কথা ছিল কিন্তু কেন জানি না আসেননি। অরুণদা আমাকে দিয়েছে এই ডায়েরি খাতাটা, বলেছে রোজ ডায়েরি লিখলে নাকি স্মৃতিশক্তি খুব ভালো হয়। অরুণদা খুব ভালো ছেলে। ওর বাবা এখানকার একজন বড় ডাক্তারও বটে। অরুণদার মা নেই। আমার বাবা আর ওর বাবায় খুব ভাব। কলকাতার কোন একটা কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে অরুণদা। ম্যাট্রিকে তিনটে লেটার পেয়েছে। কিন্তু ভালো ছেলেগুলোর মত একটুও বোকা নয়। অরুণদা খুব ভালো। ড্রইংরুমে পলাশ গান করল, মিসেস তরফদার গিটার এনেছিলেন. মিস্টার তরফদার ভ্যাম্প করলেন আর উনি বাজালেন। সিংজি ম্যাজিক দেখালেন—তাস উড়ে যাওয়ার ম্যাজিক। আমি আবৃত্তি করলাম—'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সুমুখ পথে।' ইলুটা এত পাজি যে ছটা ভেটকির ফ্রাই খেল, খাবার সময় তিনবার পোলাও নিল, তারপর খাওয়া শেষ না হতেই টেবিল থেকে উঠে পালিয়ে গেল। রমেশ কাকিমা খুব বকেছিলেন ওকে। আমি মোটে দুটো ভেটকির ফ্রাই খেয়েছি। মা বলেছে সবাইয়ের সামনে মেয়েদের বেশি খেতে নেই। আমি ফ্রাই খুব ভালবাসি। তাই সন্ধ্যেবেলা সুখদাকে বলে আগেই তিনটে ফ্রাই খেয়ে নিয়েছিলাম। গতবারে মা পরিবেশন করেছিলেন। এবার টুলুমাসি করল। নিচু হবার সঙ্গে সঙ্গে টুলুমাসির বুক থেকে কেবল আঁচল সরে যাচ্ছিল। টুলুমাসির বুকটা মোটেই মার মত নয়। টুলুমাসির বুকের দিকে তাকালে আমার কেমন কান গরম হয়ে ওঠে। ওর সব তাতেই বেহায়াপনা। দু-চক্ষে দেখতে পারিনে আমি ওটাকে। বাবার দিকে তাকিয়ে কথা বললে বাবা কেন যে গলে যায় বুঝিনে। বাবা কেবল টুলুমাসির দিকে তাকায়। ওয়াদিয়া সাহেব কে

ওয়াদিয়া সাহেব—যাকে লক্ষ্মীপুর কারখানার সবাই ভয় খায়—সেও তাকায়।

খাওয়া দাওয়ার পর কেউ কেউ আদর করল আমায়। ইলু জড়িয়ে ধরল, সিংজি গাল টিপে দিল। মিসেস তরফদার রমেশ কাকিমা ওরা সব মায়ের সঙ্গে দেখা করে এল। মিসেস তরফদার আমাকে টুনটুনের ভাতের দিন নিশ্চয় করে যেতে বললেন। তারপর সবাই চলে গেল। যে যার সাইকেল রিক্শা, জিপ বা মোটরে চড়ে চলে গেল। বাবা গেলেন ওদের এগিয়ে দিতে। অরুণদা এত দুষ্টু হয়েছে আজকাল কি বলব। যাবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে বলল—কী সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে মঞ্জু কী বলব। তুমি খুব সুন্দর। এমনি তো কত লোকেই বলে কিন্তু কেউ নেই ফাঁকা সিঁড়ির কোণে অরুণদার মুখে প্রথম ওকথা শুনে বড় লজ্জা করছিল। অরুণদা বলল—তুমি চমৎকার আবৃত্তি করেছ মঞ্জু, তারপর আমার গলার হার ছড়ার দিকে তাকিয়ে বলল—রাজার দুলাল ঘরের সুমুখে এলে তুমি বক্ষের মণি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো মঞ্জু। আমি এসব কথার মানেই জানি না কিচ্ছু। পাঁচটা ফ্রাই খেয়েছি। চারটে পুডিং। আমার মাথা ঘুরছিল তখন। জবাব দিয়ে ফেললাম—পারি। ও বললে তবে দাও ফেলে। ওর চোখের দুষ্টু দুষ্টু একটু হাসি দেখে ওর চালাকি বুঝতে পারলাম। গলা থেকে মালাটা খুলে হাতে জড়ো করে বললাম - নাও। ও হেসে ফেলে বলল—থাক আমি তো রথে আসিনি এখনো। যেদিন আসব সেদিন দিও। মুখচোখ গরম হয়ে গেল আমার—দোব বলেই এক ছুটে পালিয়ে এলাম ওপরে। ওর বাবা ওকে বিলেত পাঠাবে বলেছে। ঘুরে এলে হবে।

ভরপেট খেয়ে এক ছুটে সিঁড়ি টপকে হাঁপ ধরে গেল। বারান্দার রেলিঙে মাথা রেখে একটু হাঁপ জিরিয়ে নিতে নিতে কাল আমার মনে হয়েছিল আজ আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই। আজ আমি সব পেয়েছি আমার হাতের মুঠোয়। দামী ব্রোকেডের ফ্রক, জড়োয়ার নেকলেস, সোনার টোপর পরানো পার্কার কলম—আর অরুণদা বলেছে আমি খুব সুন্দর দেখতে। সত্যি কি সুন্দর—যাঃ যত বলেছে অত নয়। আরামে আবেশে আমার গলা দিয়ে তখন সেই গিটারে বাজানো গানটাই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল

—ওগো তুমি পঞ্চদশী পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে। কিন্তু গান সহজে বেরোয় না আমার গলা দিয়ে। মায়ের গলা খুব ভালো। কিন্তু ভালো হলে কী হবে আমাকে শেখাতে পারেনি। তাছাড়া এখন তো মায়ের শেখানোর অবস্থাই নেই। কিন্তু গান শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কৌশল্যা খুব ভালো গান করে। ও আজ এখানে নেই বলে আসেনি। ইলু ছিল। ওকে আমার বড্ড ভালো লাগে।

আমি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আকাশে—যেখানে ইউক্যালিপটাসের সাদা সাদা ডাল হাত বাড়িয়ে আধখানা চাঁদ আটকে ফেলতে চাইছে সেখানে। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। কী সুন্দর! তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু আমার কি ভালো কথা ভাববার সময় আছে একটুও। হঠাৎ চোখে পড়ল ওমা ফটক খোলা রয়েছে এখনও। রামবিরিজটার ওপর ঐ জন্যে বড্ড রাগ হয়। সন্ধ্যেবেলা হলেই অ্যায়সা ভাঙ খেয়ে ঘুমুবে যে গায়ে গরম চা ঢেলে দিলেও জাগবে না। চেঁচিয়ে উঠলাম - রামবিরিজ! গেটের কাছ থেকে হতভাগা সাড়া দিল—খোঁকিদিদি। জিজ্ঞাসা করলাম, ফটক বন্ধ করনি কেন?

—বাবু থোড়া ঘুমনে গয়া খোঁকিদিদি।

—কিস কো সাথ?

নাগরা মসমসিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে এল রামবিরিজ, গম্ভীর গলা খাদে নামিয়ে বলল—টুলুমাসি হায় উনকো সাথ। নাগরা মসমসিয়ে চলে গেল রামবিরিজ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন ছাই হয়ে গেল। টুলুমাসিটা বড় বেহায়া। আর আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল মা কত ভালো। মা রাগলে মায়ের চোখের দিকে চাওয়া যায় না। মা ভালবাসলে মায়ের চোখ ছাড়া কোনদিকে তাকান যায় না। আমি নিজের ঘরে যাবার পথে পর্দা সরিয়ে মার ঘরে ঢুকলাম।

মায়ের ঘর এবাড়ির মধ্যে সব থেকে ঠাণ্ডা ঘর। এখানে মিটমিটে নীল আলো জ্বলে। ঘরের জানলায় কালো পর্দা, সারাদিন শোঁ শোঁ টেবিল ফ্যানের ফুরফুরুনি। আর বড় দেওয়াল-ঘড়ির টক্‌টক্‌ শব্দ। এ ঘরে আর কোন শব্দ নেই। গলা নামিয়ে 'মা' বলে ডেকে মায়ের খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেস্টনাট রঙের ইংলিশ প্যাটার্নের খাটের বাজু ধরে মায়ের দিকে তাকালাম।

বালিশের পর বালিশ চাপিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মা বসেছিল। মায়ের হাতের কাছে একটা কলিং বেলের বোতাম। চেঁচাতে পারেন না, দরকার হলে বোতাম টেপেন। সেই একবছর আগের মোটর অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে মা ভালো করে বসতে পারে না শুতে পারে না। ঘুমোয় না, সারা শিরদাঁড়ায় সারাদিন মায়ের যন্ত্রণা। কোমরের দিকটা গরমকালের সাঁওতালী নদীর মতন শুকিয়ে যাচ্ছে। মায়ের যে কোলে মুখ গুঁজে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম একদিন—

মা ডাকলেন – মঞ্জু।

আমি মায়ের বুকে মাথা রেখে বললাম—মা।

—ওরা সব চলে গেল ? মাথায় গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন মা।

—হ্যাঁ, মায়ের বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে জবাব দিলাম।

—অরুণ এসেছিল ?

—হ্যাঁ এই খাতাটা দিয়েছে অরুণদা, সিংজি দিয়েছে এই পার্কার কলম, হাতব্যাগ দিয়েছেন—

—কিন্তু তুমি আবার ইয়ক ফ্রকে হাত মুছেছ—দেখ তো বিচ্ছিরি তরকারির দাগ হয়ে গেছে। তুমিও বড্ড অবাধ্য মঞ্জু।

আমি জানি কী করে মাকে বশ করতে হয়। একটুখানি গুঁইগুঁই করে বললাম—আর কক্ষনো করব না মা।

ঘড়িটা টক্‌টক্ করতে লাগল। ফ্যান শোঁ শোঁ।

মা আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন খানিক বাদে – তোমার বাবা কোথায় ?

বললাম—রামবিরিজ বলল বাবা একটু বাইরে গেছে।

—টুলুমাসি ?

এই কথাটাকেই আমি তখন ভয় করছিলাম, শুকনো গলায় বললাম—বাবার সঙ্গে আছে। মায়ের বুকটা দুলে উঠল যেন। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে মা বললেন,—যাও মঞ্জু শুয়ে পড়ো গে রাত হয়ে গেল।

মায়ের ঘরে রাত্রে সুখদা শোয়, তখনো আসেনি।

মায়ের ঘর আমার ঘরের মধ্যে দরজা। নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিলাম। ইউক্যালিপটাস গাছ চাঁদকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। ফ্রকটা খুলে ফেললাম। বেড কভার একটানে সরিয়ে ফেলে মেজেয়

ছড়িয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। ভেতরের জামাটা শুধু রইল গায়ে।

তখন আমার ঘুম আসছিল। মনে হচ্ছিল একটু জল খেলে হত। ঘুম আসার সময় কী রকম এলোমেলো হয়ে যায় সব। মনে পড়ছিল ওগো তুমি পঞ্চদশী—তুমি কি সুন্দর অ রয়ে হ্রস্ব উ আর মূর্ধণ্য ণ সিংজির হাতে তামাকের গন্ধ···ইলু গাল ফুলিয়ে খায় কেন? আলো জ্বলে উঠল মায়ের ঘরে। মায়ের ঘরে বাবা এলেন। মা কী বলছে বাবা কী সব বলছেন একটু জল খেলে হত। কত রাতেও শুনতে পেলাম কে যেন কর্ক খুলল। গেলাসের ঠুং শব্দ। কত রাত তখন আমার শুধু বলতে ইচ্ছে করছিল—রামবিরিজ ফাটক বন্ধ্ কর দেও।

১৪ই মে—

একটা হৈ-চৈ-এর পর মনটা কেমন ফাঁকা ফাকা লাগে। আমারও তাই হচ্ছিল। ইলুটা এলে একটু গল্প করা যেত তাও কাল আজ দু-দিনই আসেনি। কাজেই কী করি বড় ঝুল হয়েছে বলে নিচের তলার কোণের ঘরটা খুলেছিলাম আজ দুপুরে। সুখদাকে ঝুল-ঝাড়াটা নিয়ে এসে ঘরটার ঝুল পরিষ্কার করতে বললাম একবার। এই ঘরটা আমাদের বন্ধই থাকে। এর নাম বাজে ঘর। যত রাজ্যের পুরনো জিনিস যা আর এখন আমাদের কাজে লাগে না সেই সব জিনিসে ঘরখানা বোঝাই। কখনো সখনো ছুটির দুপুরে এই ঘরখানায় ঢুকে পড়ি আমি। এ ঘরের অধিকাংশ জিনিসই আমাদের আগের বাড়ির জিনিস। তখন আমরা প্রথম এসেছি রূপসাডিহিতে। দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতাম আমরা চন্দনপুরী বলে একটা বাড়িতে।

পুরনো একটা নড়বড়ে কাঁঠাল কাঠের চৌকি পড়ে রয়েছে এক কোণে। ঐ চৌকি আর একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল—সেটাও রয়েছে চৌকিটার ওপরে। এই ছিল তখন আমাদের বাড়িতে কাঠের আসবাব। চৌকিতে আমি মা আর বাবা শুতাম। মেজেয় ভীষণ স্যাঁতা ছিল বলে। চৌকির ঘাড়ে চেপেছে এখন টেবিলটা। তখন সে আস্পদ্দা তার ছিল না। টেবিলটা পাতা থাকত চৌকির পাশে। বাবা সকালে চৌকিতে বসে

টেবিলে আয়সি রেখে দাড়ি কামাত। খানিক পরে ঐ টেবিলেই আঁকি-বুকি আঁকা নীল কাগজ মেলে বসত বাবা। আমার হাতে ছুরি দিয়ে কাটা দাগটা এখনো রয়েছে, মায়ের হাত পাখার দাগ আমার পিঠ থেকে কবে মিলিয়ে গেছে।

প্রথম লিখতে শিখে চৌকির গায়ে পাথুরে খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম 'বাবা' 'মা' 'মনজু'। খড়ির সাদা দাগ মুছে গেছে। আঁচড় দেওয়া আখরগুলো এখনো রয়েছে। আরেক দিকে রয়েছে ভাঙা টিনের তোরঙ্গ দুটো। একটার মধ্যে ছিল আমার ছোটবেলাকার পেনি, ফ্রক আর ইজের। খুলে খুলে দেখতে লাগলাম। কী ছোট্ট ছিলাম যে। পুরনো জামাকাপড়ে কেমন একটা ছেলে-বেলাকার গন্ধ থাকে। একরাশ ফুটো ফাটা কলাই করা বাসন…তার মধ্যে একটা ছোট্ট গেলাস আছে। আমি জল খেতাম। এদিকে পড়ে আছে একটা তোলা উনুন। আমাদের ও বাড়িতে ঠিক রান্নাঘর বলতে যা বোঝায় ছিল না। তাই ঘরে ঝুল হবে বলে বাইরের বারান্দায় উনুন ধরাতো মা। একগাদা গ্লাক্সোর টিন ডালডার টিন। কোনটায় মুসুরির ডাল লেখা, কোনটায় মুগের ডাল।

এই ঘরটায় এসে দাঁড়ালেই আমার একটা দিনের কথা না মনে পড়ে পারে না। আমার যতদূর মনে পড়ে সেই প্রথম জীবনে মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগড়া হল দেখলাম, তখন অনেক রাত। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বাবা-মায়ের কথা শুনে। বাবা মায়ের গয়নাগুলো কেন জানি না ক-দিনের জন্য চাইছিল। মা দোব না বলছিল। মা বলছিল—আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে, তোমার তো এই অবস্থা। আমার গয়না মঞ্জুর বিয়ের গয়না, ওতে তোমায় হাত দিতে দোব না। বাবা বলছিল—ওয়াদিয়া সায়েব তাহলে পিল্লাইকে দিয়ে দেবে কণ্ট্রাক্টটা। পিল্লাই আর তার বউ ওয়াদিয়ার কুঠিতে গিয়ে প্রায়ই পিক্‌নিক্ করে। তোমার দ্বারা তো তা হবে না…শুনে মা তেলে বেগুনে জ্বলে গিয়েছিল। যা তা বলেছিল মা বাবাকে। বলেছিল ব্যাচিলার্স কোয়ার্টারসে কেউ বউ নিয়ে যায় না তোমার মত লোক ছাড়া। বাবাও বলেছিল যাতা। বলেছিল—সাবিত্রী হয়ে থাকলে জঙ্গলেই থাকতে হয়, লোকালয়ে আসতে নেই। মা বাবার মাঝখানে শুয়ে আমি চুপ করে পড়েছিলাম। বাবা বলছিল—এমন চান্স আর আসবে না।

(একদিন বাবার সম্বন্ধে রমেশকাকু বলেছিল—যুদ্ধটা ফসকে গেছে নিজের বুদ্ধির দোষে, স্বাধীনতাটা আর সিতাংশু সান্যাল ফস্‌কাতে দেবে না।) সে রাত্রে বাবা বলেছিল আমি এই দু-কুঠুরি ঘরে পড়ে থাকব আর পিল্লাই বেটা মাদ্রাজী হয়ে বাড়ি হাঁকাবে, গাড়ি হাঁকবে, তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো। মাকে শেষ অবধি গয়না দিতে হয়েছিল কিন্তু। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরের রাত্রে আমাকে আর মা বাবার মাঝখানে শুতে হল না।

কিন্তু ঐ কণ্ট্রাক্‌ট পাবার পর থেকেই সেই যে আমাদের কপাল খুলে গেল (বাবার কথা) তারপর আমাদের দিন দিন অবস্থা পালটে যেতে লাগল। কলে জল এলে পর কল খুলে দিয়ে আঁজলা পেতে দাঁড়ালে যেমন আঁজলা ছাপিয়ে জল উছলে পড়ে আমাদের দুখানা ঘরও তেমনি দেখতে দেখতে জিনিসপত্রে উছলে গেল। দু-বছরের মধ্যেই বাড়ি কেনা হল আমাদের। নতুন করে গড়ে পিঠে নিয়ে এ বাড়িখানা সাজিয়ে ফেলা হল। মায়ের নামে হল বাড়ি। অশ্রুনিলয়।

তারপর আর একবার বাবাতে মায়েতে ঝগড়া দেখেছি। সে এ বাড়িতে এসে। আমাকে কনভেন্টে পাঠানো নিয়ে, বাবা মাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে বলছিল। মা বলছিল—মাও জ্বলছে। সেবারও সেদিনই ভাব হয়ে গিয়েছিল ওদের। তা নইলে এর আগে আর ঝগড়া দেখিনি। বাবাতে মায়েতে ঝগড়া আমি একদম ভালবাসি না।

১৫ই মে, ১৯৫৫

ইলু এসেছিল সকালে। টুলুমাসির কথা বলছিল। টুলুমাসির কথা বলতে গেলে সুখদা বলে কাক ডাকলে বসতে হয়, শেয়াল ডাকলে উঠতে হয়। টুলুমাসি রমেশ কাকিমার খুড়তুতো বোন। ও এখানে থাকত না ক-মাস হল এসেছে। রমেশকাকুর সিমেন্টের ব্যবসা আছে কোথায় যেন। বাবার সঙ্গে রমেশকাকুর এই দু-বছর হল ভাব হয়েছে। এখন রমেশকাকু সবসময় রেডি বাবাকে খুশি করতে। এই সেদিন যখন কারখানায় সিমেন্টের জোচ্চুরি ধরা পড়ে রমেশকাকুর হাতে দড়ি পরার যোগাড় হয়েছিল— লোকে বলে তখন নাকি বাবাই কী সব কায়দা কসরত করে রমেশকাকুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়

টুলুমাসিকে নিয়ে বাবা গিয়েছিল মিঃ ওয়াদিয়ার ওখানে তদ্‌বিরে। ছ-ফুট লম্বা মিঃ ওয়াদিয়া নাকি টুলুমাসিকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি। বাবার সঙ্গে টুলুমাসির তখন থেকেই খুব ভাব। বাবা বলেন টুলুমাসি খুব স্মার্ট মেয়ে। প্রথম প্রথম কিন্তু বাবাতে টুলুমাসিতে এত ভাব ছিল না। কিন্তু মায়ের অসুখের পর ছ-মাস যেতে না যেতেই টুলুমাসি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল, টুলুমাসির কথা ওয়াদিয়া সায়েব খুব শোনে কিনা তাই বাবা মাকে বলল টুলুকে হাতে রাখা দরকার। পিল্লাইকে ডিফিট দিতে হলে এছাড়া নাকি আর কোন উপায় নেই।

মা বলেছিল টুলুকে হাতে রাখতে গিয়ে তুমিই যেন টুলুর হাতে চলে যাচ্ছ। বাবা কোন জবাব দেয়নি সেদিন।

টুলুমাসি কিন্তু সধবা। ওর বর ওকে নেয় না। সবাই বলে ও নাকি প্রথমে বিধবাই ছিল, পরে আবার ওর বিয়ে হয়। সেই বর ওকে নেয় না, না ওই বরের ঘর করে না, কি একটা গোলমাল আছে বুঝি না। টুলুমাসির গায়ের রঙ সাজামাজা, নাক ছোট্টর মধ্যে বেশ। গলায় তিনটে খাঁজ। কোমরটা খুব সরু। থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজে কোমরটা দেখায় বেশ। লম্বা হাতার ফ্রিলে লম্বা চেহারার টুলুমাসি রাতদিনই হাসি হাসি। এদিকে রোগা রোগা কিন্তু ওদিকে স্বাস্থ্য ভালো বুকে টুলুমাসি অল্প একটু আঁচল ফেলে রাখে।

ইলু বলে, টুলুমাসি চালু দি গ্রেট। আমি সকালে বলছিলাম ওকে—টুলুমাসির ফিগারটা বেশ। ইলু হাসছিল, ওর সব তাতেই ঠাট্টা, বলছিল ওর সবটা সত্যি নয়—ফল্‌স আছে কিছু। ফলস আবার কী। ইলু বলল, তুমি নেকি কিছু জানো না। ও বলতে যাচ্ছিল ফলস মানে কী—কিন্তু বলবার আগেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, ওর মুখ চেপে ধরলাম। কী অসভ্য যে ইলুটা হচ্ছে আজকাল। মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে ইলু বলল—বিশ্বাস না হয় চল আমার সঙ্গে টুলুমাসিদের বাড়ি, এখন সকালবেলা তো দেখলেই বুঝতে পারবি। আঃ ইলু তুমি কী সব যাতা কথা শিখেছ যে। ইলু বলল—এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি—আমি সেদিন সকালে ছিলাম রমেশ কাকিমাদের বাড়ি। তোর জন্মদিনে যে সিফনটা পরে এসেছিল টুলুমাসি সেটায় কী করে গুচ্চের চোরকাঁটা বিঁধিয়েছে, নিজে তুলছিল বসে বসে আর আমাকে বলল তুলে দিতে। দিলাম কী করি আর তাই তো তোর

এখানে আসতে পারলাম না। তুই বোধ হয় রাগ করছিলি আমার আসা হল না দেখে ?

বললাম—না।

—কী করছিলি সেদিন সকালবেলাটা ?

ওকে কিছু বলিনি। আমিও সেদিন সারা সকাল চোরকাঁটাই বাছছিলাম বাবার মোজা আর প্যান্টের পায়ের দিক থেকে। থাকগে মরুক গে।

১৭ই মে -

টুনটুনের ভাত হল আজ, টুনটুন মিঃ তরফদারের ছোট ছেলে। খুব ঘটা হয়েছিল। সারা বাড়িটা নীল লাল আলো দিয়ে যা সাজিয়েছিল গ্র্যাণ্ড। কাপড় দিয়ে সাঁচির তোরণের মত গেট করেছিল। আর মাইকে সুন্দর সুন্দর ফিল্মের গান বাজাচ্ছিল। 'পথ ফুরিয়ে গেল' আর 'আই বাহারের' সব কখানা গানই পালা করে বাজাচ্ছিল। আমার শনিবারের অনুরোধের আসর এবার খোলা হয়নি। শুনেছিলাম পথ-ফুরিয়ে গেল-র দুখানা গান হয়েছিল এবার। তাতে মন পুষিয়ে গেল আমার। আমাদের রূপসাডিহিতে সিনেমা দেখার বড় অসুবিধে। সিনেমা দেখতে হলে সেই আসানসোল। কাজেই অনুরোধের আসরে সিনেমার গান শুনেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। অবশ্য পথ ফুরিয়ে গেলটা আমি দেখেছি।

কত লোক যে তরফদারদের বাড়ি হয়েছিল কী বলব। নাইলন-প্যারাগন-জড়োয়া লাল সবুজ হলুদ ঠিক যেন টেকনিকালার ছবির পর্দার মত লাগছিল বাড়িটা। আমার লাভ হয়েছে দুটো—পেছন দিকে বোতাম দেওয়া এক রকম ব্লাউজের কাট জেনে এলাম। আর শিখে এলাম পথ ফুরিয়ে গেলতে বিশাখা রায় যেমন করে বাবা মরে যাওয়ার সিনে খোঁপা বেঁধেছিল সেই রকম করে খোঁপা বাঁধার কায়দা। ওটা আমার অনেক দিনের লোভ ছিল।

আমি তো প্রথমটা গিয়ে হাঁফিয়ে উঠি—গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে অবশ্য। কিন্তু বাবা গিয়েই টুলুমাসির সঙ্গে ভিড়ে গেল। তারপর ওয়াদিয়া সায়েব আসতেই সবাই ওয়াদিয়া সায়েবকে নিয়ে পড়ল। ইলু কৌশল্যা তখনও গিয়ে পৌছয়নি। এক গিয়েছিল রমলা। রমলাকে আমি দেখতে পারিনে। মেয়েটা ভীষণ

পাজি। ইতিহাস পরীক্ষার দিন এবার অশোকের চরিত্রটা লিখতে দিয়েছিল। তা ও বাড়ি থেকে অশোকের চরিত্রটা লিখে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের ঘরে ছিল কমলাদি। কমলাদি যেই বরকে চিঠি লিখতে বসেছে ও অমনি ব্লাউজের ভেতর থেকে সেটাকে বার করে সমস্তটা টুকলিফাই করে দিলে। আর আমি অশোকের চরিত্র ভুলে গিয়ে একটু আকবর একটু শেরসাহ অশোকের নামে চালিয়ে এলাম। কত করে বললাম—তোর দুটি পায়ে পড়ি ভাই একটু একবারটি দেখা—ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। যাক সেকথা, খানিক বাদেই ইলুরা এল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আজকে বাবা খুব জব্দ হয়েছে। ওয়াদিয়া সায়েব যত হেসে হেসে টুলুমাসির দিকে চায় কথা কয়, খিল খিল করে হেসে টুলুমাসি যত ওয়াদিয়া সায়েবকেই তোয়াজ করে, বাবার তত মুখখানা ডবল হয়ে কালো হয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল বেশ হচ্ছে—থ্যাঙ্কয়ু ওয়াদিয়া সায়েব।

লক্ষ্মীপুর আর রূপসাডিহিতে ওয়াদিয়া সায়েবের নামে সবাই কানে আঙুল দেয়। আমার কিন্তু ওয়াদিয়া সায়েবকে তত খারাপ লাগে না। ডিপ্ খয়েরী রঙের প্যাণ্ট আর সাদা চকচকে হাওয়াই সার্টে ছ-ফুট লম্বা ওয়াদিয়া সায়েবকে দিব্যি দেখতে। বাবা যখন ওয়াদিয়া সায়েবের সঙ্গে কথা বলে তখন বাবাকে কেমন কাঁচুমাচু লাগে। আমার হাসি পায় ভীষণ। আবার সেই বাবা যখন রমেশ কাকুর সঙ্গে কথা বলে তখন রমেশকাকুকে কাঁচুমাচু লাগে। একটু পরেই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ওয়াদিয়া সায়েব কেটে পড়ল। যাবার সময় পৌঁছে দেবে বলে টুলুমাসিকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল। টুলুমাসি যতক্ষণ ওয়াদিয়ার সঙ্গে কথা বলে বাবার দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। টুলুমাসি থাকতে বাবা যাও বা কথা বলছিল, চলে যাওয়ার পর বাবা একেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেল। ওয়াদিয়া সায়েব যে টুলুমাসিকে নিয়ে গেল আমার খুব ভালো লাগল। লোকটার ওপর এতদিন আমার রাগ ছিল। কবে নাকি ও দিদিমণিদের হস্টেলে কমলাদির সঙ্গে ভাব করতে গিয়েছিল। রিণাদি আমাদের হেড-মিস্ট্রেস, তাঁকে কমলাদি বলে দেয়। রিণাদি নাকি ওয়াদিয়া সায়েবকে খুব ডেঁটে দিয়েছিল। সবাই বলে রিণাদি নাকি কমিউনিস্ট—রিণাদি ওয়াদিয়া সায়েবকে বলেছিল—ফের যদি হয় হস্টেলের দরোয়ান দিয়ে বার করে দেবে ওয়াদিয়াকে।

কিন্তু এও ছাড়বার পাত্র নয় তারপর আবার স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট। রিণাদি কমিউনিস্ট বলে রিণাদিকে স্কুল ছাড়াবার জন্যে কী হৈচৈ দিনকতক লক্ষ্মীপুরে আর রূপসাডিহিতে। রিণাদির দলে ছিলাম আমরা তখন—আমরা ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়েরা সবাই। কৌশল্যা বলেছিল যে, যদি ওয়াদিয়া বেশি চালাকি করে আমরা সবাই কমিউনিস্ট হয়ে যাব। আমি বলেছিলাম যে, রক্ষে করো সে আমি পারব না ভাই, বাবা বকবে।

তা হোক, আজ আমি ওয়াদিয়া সায়েবের ওপর খুব খুশি। ভাবলাম জিপে করে ফিরে যেতে যেতে দিদিমণিদের ক্যারিকেচার করে বাবাকে খুব হাসাবো, খুব গল্প করব। টুলুমাসি থাকলে বাবা ঠিক আমাকে ইলুদের সঙ্গে গছিয়ে দিত। কিন্তু হা কপাল, যা ভাবলাম তা কিছুই হল না। বাবা গাড়িতে গুম হয়ে বসে রইল। আমার দিকে তাকালও না। আমি জিতি আর হারি এক সঙ্গে।

১৮ই মে, ১৯৫৫

কী গরম ছিল আজ দুপুরে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ঠিক দুপুর কাঁপছিল দূরের বুড়োবুড়ি পাহাড়ের গায়ে। মোটা বিজ্ঞানদিদিমণি বলেছেন এটা হল তাপ বিকিরণ। দুপুর পর্যন্ত তাপ জমিয়ে নিয়ে তারপর আস্তে তাপ ছড়াতে থাকে পৃথিবী। খড়খড়ি খুলে আমি তাই দেখছিলাম চেয়ে চেয়ে। রাস্তায় পিচ তেতে গলে গেছে। চট চট শব্দ হচ্ছে সাইকেল কি রিক্শা গেলে। একা লাগছে বড়। আমাদের বাগানের জামরুল গাছে কী জানি একটা পাখি ডাকছিল কুক্, কুক শব্দ করে। লালে লাল কৃষ্ণচূড়ার ডালের দিকে তাকালে দুপুর রোদে নেশা ধরে যায়। তাই দেখছিলাম জানলা খুলে। এবার গরমের ছুটির দুপুরবেলাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। বাবা আপিসে। রামবিরিজ রুটি পাকাচ্ছে ওর ঘরের রোয়াকে। সুখদা ঘুমোচ্ছে কোমর অবধি খুলে। একটা কাকের তেষ্টা পেয়েছে হাঁ করে বসে আছে পেয়ারা ডালে। একটা কুকুর নর্দমার জল খেল চকচক করে। ছায়া ছোট ছোট দুপুরে কোথাও কিছু দেখার নেই। ঘুম ঘুম চোখে কিছু ভাবা যায় না।

পর্দা সরিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম। ফ্যান ঘুরছে মায়ের এলোমেলো চুল উড়িয়ে। ঘড়ি বাজছে টক্‌টক্। সাদা ফাঁকা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মা বসে আছে

নিথর। কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলেন মা। বললেন—শাড়ি পরেছিস যে। মাকে খুশি করার জন্যে বললাম—বাড়িতে পরে পরে অভ্যেস করছি মা হঠাৎ ইস্কুলে পরে গেলে বড় অসুবিধা হয়। পায়ে পায়ে বেধে যায় যেন। —দেখি কী রকম করে পরেছ? শাড়ির সামনের কুচির দিকটা খুলে ফেললেন মা। বললেন—একি গিঁট দিয়েছ কেন? এইখানটা সায়ার মধ্যে গুঁজে দিলেই হয়। শাড়ি ঠিক করতে করতে মা হাঁপিয়ে পড়লেন। বালিশে মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজে রাখলেন মা। মায়ের হাত দুটো তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ফরসা নাকের ডগায় টেবিল ফ্যানকে পরোয়া না করেই ঘাম জমতে লাগল। নিঝুমপুরী বাড়ি। একা একা একটা ঘরে কতদিন ধরে বিছানাবন্দী হয়ে রয়েছে মা। প্রথম প্রথম ইলুর মা, রমেশ কাকিমা সব আসতো। ইদানীং বড় একটা কেউ আসে না আর। রমেশ কাকিমা আমার জন্মদিনের রাত্রে এক মিনিটের জন্যে মায়ের ঘরে গিয়েছিল মাত্র। মা নাকি ভালো করে কথা বলেনি।

মা আমার বড্ড একা। বাবা কেন বেশি বেশি মায়ের ঘরে আসে না—বাবাটা যেন কী - আগে আগে সন্ধ্যেভর বাবা মায়ের কাছে বসে থাকত, গল্প করত। মায়ের শুকনো পায়ে বাবাকে হাত বুলোতে দেখেছি একদিন। মায়ের রোগা হাড়-বার করা মুখে তখন ছিল রানীর মত হাসি। আপিস থেকে ফিরে আমাকে ডেকে নিয়ে বাবা মায়ের ঘরে ঢুকত সটান। মাকে কতবার বলতে হত, যাও মুখ হাত ধোও গে, যাও ক্লাবে যাও। বাবা গল্পের পর গল্পের জাল বুনত। আমার মাথায় হাত বুলোত একনাগাড়ে। নতুন বাঁধা চুল আবার আঁচড়াতে বসতে হত বাবা চলে গেলে। তখন অন্যরকম ছিল সবই। কত মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে। মায়ের ঘরে বাবা এসেছে শব্দ পেয়েছি। মাকে বাবা চুমু খেয়েছে—শব্দ শুনে বিছানায় আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি। মা আলতো সুরে বলেছে, আস্তে মঞ্জু শুনতে পাবে। আজ এক বছরের মধ্যে সব যেন কেমন হয়ে গেল। মা মণি মা আমার—মঞ্জুর কত রাতে এখনও ঘুম ভেঙে যায়। মঞ্জু কান পেতে থাকে কিন্তু কিচ্ছু না। আজ আমার মায়ের শুকিয়ে যাওয়া হাত থেকে খুলে ফেলতে হচ্ছে চুড়ি বালা সবই আর টুলুমাসিকে দেখে বাবার যেন ফিরে আসছে আমার সেই ছেলেবেলার বাবার বয়স। যখন বাবা আমাকে দু-হাত দিয়ে

লোফালুফি করত, আকাশে ছুঁড়ে দিত— যখন ভয়ে বাবার মস্ত মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে কী আরাম হত।

সন্ধ্যেবেলায় বাবা এখন টুলুমাসিদের বাড়ি যায়। রাত্রি এগারোটায় ফেরে, কোন কোনদিন মাকে নিয়মরক্ষে চুমু দিয়ে বাবা চলে যায় নিজের ঘরে। নইলে মা বসে থাকে একলা। একবার আমাকে জিজ্ঞেস করে বাবা ফিরল কিনা, তার কিছু পরে পাছে আমি কিছু বুঝতে পারি তাই আর আমাকে নয় সুখদাকে জিজ্ঞাসা করে বাবা ফিরল কিনা। বাবা যখন ফেরে বাবার মুখচোখ চক্‌চক্ করে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনটে করে সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙিয়ে বাবা ওপরে ওঠে আর মা ঘরের ফাঁকা দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকে। মায়ের কী মনে হয়? জানিনে। আমার মনে হয় যদি একটু দেওয়ালের দিকে মা সরে বসতে পারত তাহলে মাথাটা ঠুকে দেখতো কে বেশি শক্ত— দেওয়ালটা না মায়ের মাথাটা? (এ কথাটা আমার নয় মা বলেছিল বাবাকে) মা কাঁপছিল ঠকঠক করে। তাপ জমিয়ে জমিয়ে তবে তাপ বিকিরণ করে পৃথিবী এই কথা বলেছেন বিজ্ঞানদিদিমণি। মায়ের কাঁপুনি দেখলেও বিজ্ঞানদিদি কী বলবেন? বলবেন, তোমার মায়ের মনে অনেক তাপ জমা হয়েছে মঞ্জু তিনি তাপ বিকিরণ করছেন।

টুলুমাসি······মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে টুলুমাসিকে দেখলে কেমন হয়ে যাই, মনে হয় চিৎকার করে উঠে বলি, রামবিরিজ কান পাকাড়কে উসকো গেট কা বাহার নিকাল দো—কিন্তু না মা বলেছেন রাগতে নেই, মা বলেছেন মেয়েমানুষকে রাগ সহ্য করতে হয়।

—'মঞ্জু'। মায়ের ডাকে মার দিকে তাকালাম। মা তাকিয়েছিল এদিকের দেওয়ালের দিকে। যেখানে মা, বাবা আর আমার একটা ফটো ঝুলছে সেদিকে। মস্ত বড় ফটো। দহিজুড়ির জঙ্গলে টিলার ধারে ছবিটা তোলা হয়েছিল। আমি তখন ছোট্ট। মা একটু মোটা ছিল।

ধরা গলায় মা বললেন···সিঁথিটায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দে···কাল পরাতে ভুলে গেছিস। রোজ সন্ধ্যেবেলায় মায়ের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরাই—ভুলে গেলে মা নিজেই ডাকেন। রুপোর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে মাকে সিঁদুর পরিয়ে দিলুম। এখনো কত সুন্দর আমার মা। মা বললেন—আর এক

কাজ কর ঐ নিচের দেরাজে দেখবি একটা চন্দন কাঠের বাক্স আছে। বাক্সটা দে।

বাক্সটা মাকে দিয়ে আসতে আসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐ বাক্সটায় কী আছে আমি জানি। মাকে লেখা বাবার প্রথম বয়সের চিঠি। মা এখন চিঠিগুলো পড়বে। ওর একটায় আছে আমি লুকিয়ে পড়েছি বাবা লিখছেন মাকে—'তুমি আমার চোখের মণি'।

ঠিক দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম—নিজের চোখের মণি মানুষ নিজের হাতে উপড়ে ফেলে কেন?

২১শে মে, ১৯৫৫—

রোদ ঝিলমিল বিকেল। নারকোল পাতা যেন সোনার ঝালর। আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল সুখদা আর গজ গজ করছিল আপন মনে। ফ্রক পরলে তো বটেই, শাড়ি পরলেও ফিতে না দিয়ে দু-বিনুনিই করি। নিজেই করি। সুখদাকে দিয়ে বাঁধানোয় বড় হাঙ্গামা। পিঠ সোজা করো, ঘাড় তোলো, মাথা ফিরিও না—ওর নানা বায়নাক্কা। এর আগে কখনও দু-বিনুনির খোঁপা বাঁধিনি। আজ বিকেলে ইলুরা আসবে বলে খোঁপা বাঁধলাম। বাঁধা তো নয় সে এক কারখানা। এর চেয়ে ফিতে না দিয়ে দু-বিনুনি ঝোলানো অনেক ভালো, অনেক সোজা। মাঝে মাছে শুধু চুলের ডগাটা সমান করে কেটে দিলেই কাজ মেটে। রাত্রে শোবার সময় শুধু একটু ফিতে জড়িয়ে নিলেই হয়, ঘষা লাগার ভয় থাকে না। এ এক জ্বালা। কৌশল্যা রকমারি খোঁপা বাঁধে। কৌশল্যার খোঁপার কেরামতি দেখে আমি আর ইলু ছড়া কাটি—

মেদিনীপুরের মাথাঘষা
কলকাতার চিরুনি
এমন খোঁপা বেঁধে এলাম
বেলফুলের গাঁথুনি—

কৌশল্যা বাংলা ছড়া শুনলেই মুখস্থ করে নেয়। সুখদাকে বললাম—তাড়াতাড়ি করো, ইলু বিলু কৌশল্যা সব এসে পড়বে না? সুখদা ধমক দিল—হচ্ছে দাঁড়াও না, ঠিক হবে তবে তো? সুখদা মায়ের বাপের বাড়ির তরফের ঝি।

মায়ের চেয়েও বড়। ব্যবহারটা এমন যেন আমার গার্জেন ওই। এমনি বিরক্ত লাগে।

হাতের চাপ দিয়ে খোঁপাটাকে চ্যাপটা করতে করতে সুখদা বলল—এইবার বেশ হয়েছে। হ্যাঁ আর দেখ শাড়ি শাড়ি করে তোমার মা তো হেদিয়ে গেল সারা হয়ে—কিন্তু তোমার তো কাঁচ কাকুড় জ্ঞান নেই। শাড়ির আঁচল যেন বুক থেকে সরে যায় না। কাল দুপুর বেলা লগি নিয়ে জামরুল ঠ্যাঙাতে গিয়েছিলে, হাঁ করে গাছ ঠ্যাঙাচ্ছ এদিকে যে আঁচল সরে গেছে তা কে খেয়াল রাখে? আমি বললাম—বকিসনে যা গরম। ও বললে—গরম বললে লোকে শুনবে? তাও আবার ভেতরে পরবার জামাটাও পরনি। ভগীরথ হাঁ করে দেখছিল। আমার এমন হাসি পেল শুনে যে দু-বার ঢোঁক গিলে হাসি চাপলাম। ওকে রাগাবার জন্যে বললাম—কী যে বল তার ঠিক নেই। আর তুমি যে পরশু রোয়াকে খালি গায়ে শুয়েছিলে, ভগীরথ ঘুরছিল—

নাও কথা—হাত নেড়ে সুখদা বলল, সাধে কি বলি নেকাপড়া শিখলে কী হবে তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই। তোমার আর আমার এক কথা হল—সেই বলে না কিসে আর কিসে। আমি বললাম—যাও খুব হয়েছে, বুড়ো ভগীরথকে নিয়ে তোমার আর ঢং করতে হবে না। সুখদা বলল, হ্যাঁ বুড়ো, সবাই বুড়ো, ভগীরথ বুড়ো, তোমার বাবা বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে চঙ করে উঠল আমার মাথাটা। ঘুরে বসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম—কী বলছ সুখদা। সুখদা থতমত খেয়ে গেছে তখন—আর তখন ঠিক তখন কিরিরিরিং করে মায়ের ঘরের কলিং বেলটা বেজে উঠল। আমি বাথরুমের দিকে চলে যেতে যেতে শুনলাম মা সুখদাকে বকছে।

যাই বলি না কেন বাথরুমের মত জায়গা গরমকালের বিকেলে আর কিছু নেই! ঠাণ্ডা ভিজে ঘর, চৌকো চৌকো পাথর বসানো মেঝে আর দেদার জল। ঢালি, ছিটাই, আঙুলে করে চোখের পাতায় কি ভিজে হাতখানা রাখি ঘাড়ে—যা করি তাতেই আরাম। ফ্রক, ভেতরের জামা খুলে জল ঢাললাম গায়ে। কচি কলাপাতা রঙের সাবান সাদা ফেনা ছড়াতে লাগল সারা শরীরে। সাদা নরম ফেনা আর মিষ্টি গন্ধ কী ভালো লাগে। ইজেরের কষে-বাঁধা দড়িটার ফাঁস আলগা করতেই চিনচিন করে উঠল দাগপড়া জায়গাটা—কেমন একটা আরাম

হয়। কচি কলাপাতা রঙের সাবানটা বুকের ওপর দিয়ে টেনে নিতে গিয়ে ভগীরথের কথা মনে করে হাসি পেল। সুখদাটা যেন কী। নিজের দিকে তাকাতে ভীষণ লজ্জা করছিল তখন! চোখ বুজে ফেলে মুখ ঢেকে ফেললাম সাবানের ফেনায়।

একটু পরে সবাই এল—ইলু বিলু দু-বোন আর কৌশল্যা। কৌশল্যা আয়ার মাদ্রাজী। বাংলা বোঝে বলেও বেশ। ওরা কিন্তু সব ফ্রক পরে এল। ইলু নীল। বিলু কালো ভয়েল। কৌশল্যা লালফোঁটা দেওয়া সাদা। আমি এদিকে শাড়ি পরে বসে আছি। এমন রাগ ধরছিল কী বলব। ইলু বলল—জামরুল খাবে তাই সব ফ্রক পরে এসেছে, গাছে উঠতে হবে না! ওদের সব আমাদের বাড়ি এলে ভারি ফুর্তি হয়। মা পড়ে রয়েছে, বাবা আপিসে - কেউ তো বকবার নেই। আমিই আজ ধমক দিলাম- না জামরুল গাছে ওঠা হবে না ভগীরথ দেখে। সুখদা বলেছে। কী দেখে, জামরুল গাছ থেকে পড়ল যেন ইলু। ইলুকে কানে কানে বললাম, ইলু বলল, যাঃ। তারপর ইলু বলল, বিলুকে বলিসনে, ও যা হাঁদা সবাইকে বলে দেবে। কৌশল্যাকে বলা হল। ওর হাসি আর থামে না। ভারি সুন্দর ঝকঝকে দাঁত ওর। তারপর বলা হল না বলে বিলু ইলুর ওপর রাগ করে বাগানে চলে গেল। একটু পরেই বিলুকে দেখা গেল সুখদার পিছু পিছু ঘুরছে, তারপরেই বিলু লাফাতে লাফাতে চলে এল। ও শুনেছে সব, এমা তোমরা কী অসভ্য দাঁড়াও। আমি বললাম—এই বিলু কি হচ্ছে, যদি কারু কাছে শুনি একথা তো দেখবে। ও বলল, আমায় বলোনি কেন আগে, আমি যাবার রাস্তায় রমলাদের বলে তবে বাড়ি যাবো।

একটা আস্তো কেক কাটলাম। ভাগ করে দিলাম ওদের। ইলুকে বেশি দিলাম, বললাম যার যেমন শরীর সে তো তেমনি খাবে। ইলুটা এদিকে খুব ভালো। মোটা কিন্তু মোটা বললে রাগে না। শুধু বেশি খায় বললে রেগে যায়। বলে সব খোঁটা সহ্য হয়, খাওয়ার খোঁটা সহ্য হয় না। কিন্তু এতে শানালো না ইলুর। গাছে ও সেই উঠল তবে ছাড়ল। আমাকে আঁচল পেতে তলায় দাঁড়াতে হল। শাড়ি নষ্ট হবে বলে মা দেখলে বকে কিছু রাখত না। ও ডাল থেকে জামরুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার আঁচলে

ফেলতে লাগল। জামরুল খেতে খেতে ফেন্সিঙের তার ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই। বিলু আমগাছের টাঙানো দোলনা চড়ে বসল। তার ফ্রক উড়ে উড়ে সাদা সাদা পা ঝিলিক দিতে লাগল দোলার সঙ্গে সঙ্গে। কোমর বেঁকিয়ে দুলতে শুরু করল ও জোরে আরো জোরে, আর ওর দোলা দেখে দুলতে ইচ্ছে করছিল আমার। তারে পা বাঁধিয়ে পা নাড়াতে নাড়াতে আমরা দূরের বুড়োবুড়ি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিকেল। লক্ষ্মীপুরের কারখানার ছুটি হয়েছে। সাইকেলে পায়ে হেঁটে লোকেরা সব কারখানা থেকে ফিরছে। সাঁওতাল ছেলে আর মেয়ে। পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী। কেউ একা একা, কেউ দল বেঁধে। পলাশের বাবা রমলার বাবা গল্প করতে করতে ফিরলেন। ওদিকে জোড়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমদিকের পরীহাটি গাঁয়ের মাথায় তখন আকাশে কাটাকাটা মেঘে রকমারি রঙ, যেন পূজোর আগে সিল্ক হাউস। মেরুন, কমলা, বাসন্তী, লাল, ম্যাজেন্টা রঙের ছয়লাপ। কোথাও সোনালী পাড় দেওয়া কালো জামদানি। আহা! হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঐরকম মেরুন রঙের আমার একটা ব্লাউজ আছে—কমলা রঙের পছন্দসই শাড়ি পাচ্ছি না বলে পরা হচ্ছে না। লাল ম্যাজেন্টা রঙ বাসন্তীর পাশে মানায়নি তা বলে বাপু, আমি বললাম। কৌশল্যা, আমি আর ইলু সেই ঝিকিমিকি বিকেলে মনের সুখে আকাশ থেকে রঙ বাছতে লাগলাম। কৌশল্যা বলল, তাড়াতাড়ি বাছো মঞ্জুরী, রঙ যে সব মিলিয়ে যাচ্ছে। চাইতে না চাইতে দেখি মেরুনের পাশে আমার সাধের কমলা রঙ কালো হয়ে গেছে—পাকা নয় রঙ, ঠকাচ্ছে ফেরিওলা, ইলু বলল। শুধু টাটকা আছে তখনো কৌশলার ফিকে গোলাপী। ঝকঝকে দাঁতে কৌশল্যা হাসছে। ওর ঐ রঙের ব্লাউজ চাইই। ইলু হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল, বলল—কিন্তু সবার চাইতে ভালো—আমি বললাম পাউরুটি আর ঝোলাগুড়। ইলু বলল—ঐ দেখ। চোখ তুলে দেখি আধখানা চাঁদ আকাশে। বিলু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, আমি বলব? ইলুদির আবার আধখানা কেক খেতে ইচ্ছে হচ্ছে চাঁদ দেখে, না ইলুদি? ইলু বলল—ভাগ্, অসভ্য।

দিনের বেলার রোদের ছায়া বদলে গাছেরা পেতে বসল চাঁদের ছায়া। পাখিরা ঘরে ফিরছে। সুখদা মায়ের ঘরের দোতালার জানলা থেকে বলল—মঞ্জু, মা

বলছে আর নয়, এবার ঘরে এস। গেটের দিকে আমি ওদের এগিয়ে দিতে গেলাম। কাকাবাবু আসতে তো এখনো দেরি আছে—ইলু বলল। আমি জবাব দেবার আগে বিলু বলল—অনেক দেরি, কাকাবাবু তো এখন রমেশ কাকিমাদের বাড়ি যাবে ওখানে থেকে জিপে করে টুলুমাসিকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, না ইলুদি? আহা! কাকিমার যে অসুখ নইলে কাকিমাকেও নিয়ে যেত। আমি তখন থেমে গেছি। কৌশল্যা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে আর ইলু কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে বিলুর দিকে যেন ওকে খেয়ে ফেলবে। বিলু থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তখন। কড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে ইলুকে বলছে—দিদি মাকে বলে দিবি না।

আজ সারা সন্ধ্যে আমার একটুও পড়া হল না। একটা লাইন লেখা হল না। সারা পাতা শুধু আঁকিবুকি কাটলাম। সারা মনে এক অদ্ভুত অস্বস্তির জ্বালা— একটু আগে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম—কৌশল্যা বলছে, আমি আমার রঙ পেয়েছি, তুমি তাড়াতাড়ি বাছো মঞ্জুরী. রঙ যে সব মিলিয়ে যাচ্ছে, আমি রেগে গিয়ে বলছি—যাকগে—যাক।

২৪শে মে, ১৯৫৫ সকালবেলা—

কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মায়ের ঘরে কথা বলছিল কে তারই শব্দ শুনে। বাবা! হ্যাঁ বাবা। বাবা আর মা উঁচু গলায় কথা বলছিল বলে মনে হল। চিত হয়ে শুয়ে কান পেতে রইলাম। দেখলাম স্পষ্ট সব কথা শোনা যায় না। চুপিসাড়ে উঠে বালিশটা জানলার দিক থেকে সরিয়ে মায়ের ঘরের দরজার দিকে করে নিলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম—মা বলছে, তুমি মনে করো কেউ কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু ভুলে যাও কেন সবাই তেমনি চালাক আছে, মাঝ থেকে বোকা হয়ে গিয়েছ তুমিই। টুলুকে নিয়ে তুমি অন্ধ হয়ে গিয়েছ।

বাবা বলছেন, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না অশ্রু—

—বোঝার অবস্থা যে তোমার আর নেই সিতাংশু। শুধু একটা কথা বুঝতে চেষ্টা করো যে জীবনটা ছেলেখেলা নয়। (এ কথাটা আমার মায়ের খুব ফেবারিট কথা—মা প্রায় বলে)

—দোহাই অশ্রু এত রাত্রে আর কাব্য নয়, দর্শন আর কাব্য করা স্বভাব তোমার গেলনা, কী যে তোমার রুণুদা তোমার মাথায় রবিঠাকুর ঢুকিয়ে রেখেছেন—

—উচ্চারণ কোরো না তুমি ও নাম! কী ভাবো টুলুকে তুমি, আমি জানি না। টুলুর সরু কোমর আর উঁচু বুক ছাড়া টুলুর আর কিছু যদি তোমার মাথায় থাকত তাহলেও বুঝতাম। তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস, আর কিছু না। আর কিছুর সামর্থ্যই নেই তোমার। হাঁপাতে হাঁপাতে মা বলল—সাকসেস্‌ফুল ম্যান হতে গিয়ে (এখানটায় মা কি বলছিল—আমি বুঝতে পারিনি, কী সব মিন্‌স এণ্ড এইসব কথা)—মা ননস্টপ বলেই চলছিল—আজ আমার মনে হয় তোমার সবটাই দম্ভ। পাশে একটা টাটকা মেয়ে নিয়ে চুয়াল্লিশ বছর বয়সেও জিপ হাঁকিয়ে সবায়ের চোখ ধাঁধাতে চাইছ তুমি, কিন্তু নিজে কোন্ ধাঁধায় পড়ছ জানই না। পাঁচ বছর আগে একহাতে অ্যালসেসিয়ানের চেন আর একহাতে তোমার সুন্দর বৌয়ের হাত ধরে পাইপ কামড়ে তুমি যখন প্রথম বেড়াতে বেরুতে আরম্ভ করেছিলে তখনও তোমার একই উদ্দেশ্য ছিল—দেখুক লোকে আমি সাকসেস্‌ফুল।

—কী বলছ তুমি অশ্রু!

—ঠিক বলছি।

—তাহলে বলি এবার আমারও কি কোন অভিযোগ নেই তোমার কাছে?

—আছে, কিন্তু সে অভিযোগের কোন দাম নেই আমার কাছে। তোমার অভিযোগকেও আমি চিনি। মিঃ ওয়াদিয়ার ওখানে লাখটাকার কনট্রাক্‌টটা বাগাবার জন্যে মুখে রঙ মেখে খুকি সেজে একা একা আমি কেন ঢঙ করতে যাইনি—তোমার অভিযোগ। কেন মঞ্জুকে মেমদের স্কুলে পাঠালাম না, তোমার আর একটা ঢাক পেটানোর কাঠি কেড়ে নিলাম। তুমি যে বলতে পারলে না লোকের কাছে মেয়ে আমার কনভেন্টে পড়ে—এই সব তোমার অভিযোগ। কিন্তু সত্যি বল তো এগুলোই কি তোমার অভিযোগ?

—বাজে বোকো না অশ্রু। তুমি কি জান না ওয়াদিয়াকে, জান না কেন টুলুকে আমার হাতে রাখতে হয়!

—জানি, তুমি এর পরেই বলবে পিল্লাইয়ের কথা, বলবে পিল্লাই ওত পেতে আছে, এই তো?

—কি বলছ বল।

—তাহলে এতদিন সে অভিযোগ বড় হয়ে ওঠেনি কেন? আজ মনে হচ্ছে আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সটাই আসল অভিযোগ। আমার অসুখ আমার অক্ষমতা এই আসল কথা। আমি বাতিল হয়ে গেছি এই তোমার সত্যিকার অভিযোগ। টুলু কী দিয়েছে তোমায়? কী দিতে পারে?

বাবা চুপ। একটু পরে ভাঙা গলায় মা বললেন—আর কিছু নয় তোমাকে আমার জানা হয়ে গেল সে ভালোই। শুধু মঞ্জুর দিকটা তুমি দেখো। ও বড় হয়েছে ওরও একটা বোধ হয়েছে। তোমার পাপের ছায়া ওকে স্পর্শ করে কেন?

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার মনে কোন পাপ নেই অশ্রু। তুমি মঞ্জুর নাম এর মধ্যে এনো না।

মাও চেঁচিয়ে উঠল—নেই? পারো তুমি একথা মঞ্জুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে—যে পাপ নেই? মা ডাকলেন 'মঞ্জু'। আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মা আবার ডাকলেন—মায়ের গলা কাঁপছে, এবার সাড়া দিলাম। পর্দাটা মুঠো করে ধরে একটুখানি চুপ করে দাঁড়ালাম। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে তখন। টেপফ্রকটা গায়ে ছিল শুধু, পর্দা সরিয়ে সেই নীল আলোয় ঘরে ঢুকলাম। বাবা চমকে উঠলেন আমাকে দেখে যেন কতকাল দেখেননি। বাবা ডাকলেন আমাকে। আমার কেমন যেন হল। মায়ের ঘরের ড্রেসিং আলমারির আয়নায় আমার ছায়া পড়েছে। হাতকাটা সাদা টেপফ্রক গায়ে, এলোমেলো চুল, টিপ-পরা আমার ছায়ার দিকে তাকিয়ে তখন নিজেরই কেমন অবাক লাগছিল। বাবা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আমার কিন্তু একটুও লজ্জা করছিল না। শুধু বাবাকে বড় ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল। একেবারে বাবার কাছে সেই ছোটবেলার মত বাবার বুকে মুখ গুঁজলাম। বাবা বললেন 'মঞ্জু মা'। আমার তখন ঠোঁট কাঁপছিল; ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম—বাবা। বাবা চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। বাবার চোখ ভিজে ভিজে। বাবার ওপর ভয়ানক মায়া হচ্ছিল আর বলতে ইচ্ছা করছিল, বাবা তুমি টুলুমাসির সঙ্গে মিশো না। কিন্তু গলায় আটকে গেল কথাটা। কিছু বলতে পারলাম না।

২৫শে মে—

তবু একথা ঠিক বাবার কথা যখনই ভাবি তখনই মনটা যে কেমন হয়ে যায় ঠিক বোঝাতে পারব না। বাবা এক বছর আগে কী ছিল আর এখন কী হয়েছে সেকথা এ এক বছর যে অশ্রুনিলয়ে না থেকেছে সে বুঝতে পারবে না। অনেকের বাবা আছে দেখলে মনে হয় কী ভীষণ রাগী। পলাশের বাবার সঙ্গে তো পলাশের দা কুড়ুল সম্পর্ক। পলাশের বাবা ও দরজা দিয়ে ঢুকলেন তো পলাশ সুট্ করে এ দরজা দিয়ে সরে পড়ল।

আমার বাবা মোটেই সে রকম নয়। বাবার নাকটা দেখলে মনে হয় বটে যে বাবা খুব রাগী কিন্তু বাবাকে একটু মজার কথা বললেই বাবা এত হেসে ফেলত যে তখন আর একটুও ভয় করে না। আমিও তেমনি বাবাকে খুব হাসাতাম। ইস্কুলের দিদিমণিদের ক্যারিকেচার করলেই বাবা খুব হাসত। আমি দেখাতাম খুব ক্যারিকেচার করে তবে মায়ের সামনে নয়। মা বড় রাগ করে কাউকে ভ্যাঙালে।

কিন্তু তাহলেও বাবা আর সে রকমটা নেই। বাবা যেন আমাকে কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চায়। ইলুরা বলে, তোর বাবা আগে আগে আমাদের ডেকে ডেকে কেমন কথা কইতেন, আজকাল কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন দেখলে ভয় করে, না রে ?

আমার কিন্তু মোটেই ভয় করে না। করে না এই জন্যে যে আমি যে আসল কথাটা জানি। আমি যে জানি যে আমি বাবাকে ভয় করি না, আমার বাবাই আমাকে ভয় করে। টুলুমাসির সঙ্গে বাবা যখন থাকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে বাবা কেমন থতমত খেয়ে যায়। আমার ভারি বিরক্ত লাগে। ছেলেমানুষি আমি দেখতে পারিনে। আমিও আজকাল যেন কেমন-কেমন হয়ে গেছি। নইলে সেদিন বাবার প্যান্ট থেকে চোরকাঁটা বেছে প্যান্টটা যখন বাবাকে ফেরত দিতে গেলাম কী দরকার ছিল আমার বাবাকে বলার—জানো বাবা টুলুমাসির সিফনটাতেও না কী করে গুচ্চের চোরকাঁটা বিঁধে গেছে। বলব কি বাবার মুখটা এতটুকু হয়ে গেল। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা

কি বুঝতে পেরেছে যে আমি বুঝতে পেরেছি। ভগবান জানে আর বাবা জানে।

কিন্তু কী বিচ্ছিরি যখন একটা মেয়ে আর তার বাবাকে ভয় করে না, উল্টে তার বাবাই তাকে ভয় করে। কী খারাপ কথা যখন সন্ধ্যে হয়ে গেলেও যদি আমি গেটের বাইরে যাই আমার বাবা আমাকে বকতে পারে না। কী করে বকবে তার আগে তা হলে বাবার উচিত নিজেকে ধমকানো—তা বাবা পারবে না।

আজ সন্ধ্যেবেলা ভর কোন কাজ আমার হল না। অ্যালজ্যাবরা নিয়ে বসলাম, একটাও মিলল না। ছেড়ে দিলেই হত অঙ্ক, ডোমেস্টিক সায়েন্স নিলেই হত। তখন তো আর ভাবিনি যে এমন ধারা হবে। ভাবলাম তারপর যে সাহারানপুরে কাকিমাদের একটা চিঠি লিখি। কিন্তু কী লিখব? 'মা সেই রকমই আছে আর সবাই ভালো আছি।' মিথ্যে কথা, এখানে কেউ আমরা ভালো নেই, সবায়েরই অসুখ—ভীষণ অসুখ।

২৮শে মে, ১৯৫৫—

আজ সকালে অরুণদা এসেছিল। আমি জানতাম আজ ও আসবে। আজ বিকেলে ডাক্তারবাবুর আসার কথা। যেদিন ওঁর আসার কথা থাকে সে দিনই অরুণদাকে দিয়ে ডাক্তারবাবু খবর দেন সকালে কটার সময় আসবেন উনি। বাবা থাকেন সে সময়। সকালে উঠেই মনে হল স্নানটা সেরে ফেলি। ডাক্তারবাবু আসার কথা থাকলে আমি সকালে উঠেই স্নান করে কাজ মিটিয়ে রাখি। সুখদা হাসে। এমন রাগ ধরে। আমি যেন ঐ জন্যেই স্নান করি—যত সব……স্নান সেরে একটা হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছিলাম আমি। গায়ে দিয়েছিলাম একটা কালো ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজ। থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ পরার আমার খুব সখ কিন্তু মা বকেন। আলগা আলগা পাউডার পাফ ছুঁই ছুঁই করে গিয়েছিল মুখে। টিপ পরেছিলাম কুঙ্কুমের। চোখে কাজল দিয়েছি কি দিইনি। চুলে স্যাম্পু করেছিলাম। এলোচুল চুলেরই ফাঁসে আটকে রাখলাম। রোজ সকালে উঠে স্নান সেরে নিলেই হয়। তা রোজ ইচ্ছে করে না।

আর অরুণদা এল একটা আধময়লা সার্ট গায়ে দিয়ে। এলোমেলো একরাশ চুল মাথায়, পায়ে বেল্ট দোমড়ানো কাবলী। কী মূর্তিই হয়েছে, তার ওপর দু-দিন দাড়ি কামায়নি। হাতে একখানা গীতাঞ্জলি। ওকে মাঝে মাঝে ভূতে পায়। তখন ও কবিতা বলে আর আবোল-তাবোল বকে যার মানে খানিকটা যদি বা বোঝা যায়—ভাবার্থ একেবারেই করা যায় না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়—ভগীরথ গাছে জল দিচ্ছিল দেখছিলাম, ও সাইকেলে করে এল। ঝড়ের বেগে হ্যাণ্ডেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্যাডেল করতে করতে গেট দিয়ে ঢুকে পড়ে একেবারে ডেড ব্রেক কষল সিঁড়ির সামনে। এসেই চেঁচিয়ে বলল— মঞ্জু, বাবা আ'বে জাস্ট্ পাঁচটায়।

ওকে নিয়ে গেলাম বাগানে। রান্নাঘরের পেছনে গোলাপ বাগানে। আজ ওর ভূতে পাওয়া মন—চেহারা দেখেই বুঝেছি আমি। লালগোলাপ ও ভালবাসে। কিন্তু যা চেহারা করে এসেছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িমুখ আর গোলাপ ফুল দিতে ইচ্ছে করছিল না ওকে। আর বাব্‌বা : কী আজে বাজে বকতেই পারে অরুণদা। সব কি আমি শুনেছি। রান্নাঘরে সুখদা রয়েছে, একবার উঁকি মেরে আমাদের দেখেই মুখটা সরিয়ে নিল। পরে আমায় ঠাট্টা করবে। আজ অ্যায়সা তাড়া দেব বুঝতে পারবে। সব তাতে ইয়ারকি দেওয়া বেরিয়ে যাবে এখন। রান্নাঘর থেকে ফোড়নের গন্ধ নাকে আসছিল, বিচ্ছিরি লাগছিল। কী একটা ধরে যাচ্ছে না তো? এদিকে ও আমায় জিজ্ঞেস করছে কি—মঞ্জু তুমি এত সাজো কেন? আমি তো হাঁ হয়ে গেলাম শুনে। সাজি কেন মানে? এমনি সাজি, সবাই সাজে তাই। হাঁচি আসছিল ভীষণ— সুখদাটা কী করছে রান্নাঘরে যে। ও তখন বলছে—সাজলে তোমাকে ভীষণ দূর দূর মনে হয়, আর—আর কী, নাঃ ভীষণ নাক সুড়সুড় করছে—ও বলছে, আর মনে হয় আমি ভয়ানক খারাপ দেখতে, তুমি কত সুন্দর। চারটে গোলাপ ফুল তুললাম। একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে হাঁচি সামলালাম। ওকে দিয়ে বললাম—নাও বোকো না আর, কলকাতা গিয়ে খুব বাজে বকতে শিখেছ তুমি। ও হাতে করে ফুলগুলো নিল, বলল—তুমি কবিতা ভালবাসো না মঞ্জু?

বললাম—না।

এত ভালো ভালো কথার সময় হেঁচে ফেললে বিশ্রী হবে।

অরুণদা বলল—কেন ?

—বুঝতে পারিনে যে।

—এই কবিতাটা বুঝতে পারো না, বলেই ও আবৃত্তি করতে লাগল—সুন্দর তুমি এসেছিল আজি প্রাতে, অরুণবরণ পারিজাত ছিল হাতে। বলতে বলতে ওর চোখ চকচক করছিল। সত্যি বলব ভীষণ সুন্দর লাগছিল ওকে। আর ঠিক সেই সময় আমি জোরে হেঁচে ফেললাম, এত লজ্জা করছিল। অরুণদাও বলল—মঞ্জু আমি যা বলি তুমি বুঝতে পারো না।

ঠিক নয়, ঠিক নয় অরুণদা আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারিনে। যাক্ বাঁচা গেল, অরুণদাও হেঁচে ফেলল ততক্ষণে, একটা নয় দুটো।

বিকেল পাঁচটায় ডাক্তারবাবু এলেন। সুখদা আড়ালে বলে, তোমার শ্বশুরমশাই। আমাকে তিনি ইয়ং লেডি বলে ঠাট্টা করেন। ডাক্তারবাবু বেশ মোটাসোটা মাথায় সুন্দর চকচকে টাক। বাবাতে ডাক্তারবাবুতে কত কথা হল। মা বেঁচে থাকবে, যন্ত্রণা কমবে। কিন্তু মা সারবে কি ? আমি কেবল ভাবি মায়ের যদি আর কিছু হয়—যা মুখে আনতে নেই তাই যদি মায়ের হয় তাহলে ভগবান না করুন বাবা নিশ্চয়ই টুলুমাসিকে বিয়ে করবে। তাহলে বাবার নামে ভীষণ বদনাম হবে, আর বাবার নামে বদনাম রটলে এবাড়ির মেয়ে অরুণদার বাবা নেবে না। আমার কেবল ভয় করে অরুণদা যেন টুলুমাসির কথা জানতে না পারে। সে বড় ঘেন্নার কথা হবে তাহলে। মুখ দেখানো যাবে না অরুণদাকে।

দূর হোক গে আজ ওসব কথা ভাবব না। মস্ত বড় হলুদে চাঁদ উঠেছে পামগাছের ওধারে। রামবিরিজ ভাঙা গলায় রামায়ণ পড়ছিল—রোজ শুনে শুনে আমার দুটো লাইন মুখস্থ হয়ে গেছে। কোন কোনদিন ওকে ভ্যাঙাই আজ কিন্তু শুনতে ইচ্ছে করছিল বড়। ও বলছিল—

বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাওয়া
সুর দুর্লভ সব গ্রন্থ কি গাওয়া—

মানুষ জন্মই সব থেকে দুর্লভ, বড় ভাগ্যে মানুষ জীবন।

ভগীরথ কি একটা ওড়িয়া গান করছিল। অন্যদিন হাসি পায় শুনলে। আজ

কেন জানি না বড্ড ভালো লাগছিল। ভালো লাগলে বুকটা কেমন টনটন করে। কী যেন পদ্যটা বেশ -

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে -
অরুণবরণ পারিজাত ছিল হাতে।

কে এই সুন্দর, আমি নাকি ? কে জানে। অরুণদা, মিথ্যে বলেছি তোমায় ওবেলা। কবিতা আমি ভীষণ ভালবাসি। কেননা তুমি ভালবাসো যে। খুব খুশি হলে চোখে জল আসে কেন আমার? তারপর চুপিচুপি বালিশের কানে কানে আমি সেই কথাটা বললাম। যে কথাটা বললাম যে কথাটা বলতে নেই, যে কথাটা লিখতে নেই।

৩০শে মে—

আজ সারাদিন সকাল থেকে মনটা আমার বেশ খুশি খুশি। সকাল থেকে আকাশ ভেঙে পড়ছিল যেন রোদে। যদিও নানান সাত-পাঁচ কারণে বাড়ি থেকে বিশেষ বেরুই না তবু আজ বিকেলে মনে হল একবার কৌশল্যাদের বাড়ি যাই। গিয়েছিলাম। কালো পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে বিকেলবেলা কালো কালো সাঁওতাল মেয়েগুলো গান গাইতে গাইতে ফিরছিল। ইঁট বয়েছে সারাদিন। ইঁটের গুঁড়ো কিম্বা লাল সুরকির দাগ ছিল ওদের সারা গায়ে। আমাদের 'পালামৌ' পড়তে হয়। তাতে লেখা আছে বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। এখানকার এইসব সাঁওতাল মেয়েদের দেখলে আমার তা বলতে ইচ্ছে করে না। তার কারণ ওরা হাসলেই ওদের ভালো দেখায়। যার যা স্বভাব সে সেটা করলেই ভালো।

কৌশল্যাদের বাড়ি গিয়ে দেখি যে কৌশল্যা দড়ি লাফাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। কৌশল্যার মাও এলেন। উনি কিন্তু বাংলা বলতে পারেন না। উনি ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। আমি বাংলায় জবাব দিতে লাগলাম। কৌশল্যার মায়ের হাসিটাও ভারি সুন্দর। হাসলে পরে মুক্তোর নাকছাবিটা কী ঝকঝক করে কী বলব। কৌশল্যার মা ভেতরে গেলেন। আমি আর কৌশল্যা ওদের বারান্দায় রইলাম।

ও বলল, ও কাশী যাচ্ছে পাঁচ-ছ দিনের জন্যে। ওর ছোট কাকার কাছে।

কৌশল্যা বেশ সুন্দরী। রেলিঙ ধরে রাস্তার লোক চলা দেখতে দেখতে গল্প করতে লাগলাম। ও মাদ্রাজী মেয়ে হয়েও নাকে কিছু পরে না। পরত, এখন বাঙালী মেয়েদের দেখাদেখি খুলে ফেলেছে। আমি ওকে বললাম, নাকটা যদি বিঁধিয়ে রেখেছিস তো একটা কিছু পরিস না কেন? খারাপ তো দেখায় না। ও বলল, আমার জন্মদিনে প্রেজেন্ট করিস পরব এখন। বলেই হাত বাড়িয়ে আমার নাকটা নেড়ে দিয়ে ও আমার কাছ থেকে শেখা ছড়া আউড়ে গেল—

নাকছাবি গহনা
কবে দেবে বল না
যদি বল কাল দোব
ভোরে উঠে চলে যাব
বলে যাব না—আ-আ।

'না' বলার সঙ্গে সঙ্গে বিনুনি দুটো দুলিয়ে ও ঘাড় দোলাতে লাগল আমি হেসে ফেললাম। ও বলল—কাল ভোরে যাচ্ছি সত্যিই, কাশী যাচ্ছি, বুঝলি বলে যাব না। হর্ন বাজিয়ে ও দিকে বোঁ করে একটা মোটর চলে গেল রাস্তা দিয়ে। এক ঝলক ধোঁয়া উড়িয়ে।

—মোটরে কে বল দিকি? কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করল।

—কী করে বলব?

—ওয়াদিয়া সায়েবের গাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোর সব গাড়ি মুখস্থ?

—নম্বর মুখস্থ।

—সঙ্গে তা হলে কে? শাড়ি দেখলাম যে—

—সেটার তো আর নম্বর নেই যে বলে দোব।

আমি বললাম—খুব পণ্ডিত তুমি।

কৌশল্যা বলল—তুই বল।

আমি বললাম—ও যদি ওয়াদিয়া হয় তাহলে সঙ্গে টুলুমাসি নিশ্চয়। ওরা দহিজুড়ির জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছে।

কৌশল্যা বলল—টুলুমাসি? যাঃ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—ও যদি ওয়াদিয়া হয় তাহলে সঙ্গে নিশ্চয় টুলুমাসি।
—বাজি।
—হ্যাঁ বাজি। যে জিতবে সে খাওয়াবে ঠিক?
—ঠিক, তুমি খোঁজ নেবে মঞ্জরী।

আরো খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কয়ে একপিঠ ক্যারম খেলে, পুরনো 'ছায়াজগত' উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে আমি চলে এলাম যখন তখন কৌশল্যার বাবা বাড়ি ফিরেছেন। বিকেল তখন গাছের ডগায় আর তিনতলার ছাদের আলসেয়। পাখিগুলো কিচির মিচির করছে গাছ-গাছালির মাথায় মাথায়।

আমি বাড়ি আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে এল। গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকে দেখি বাবা চেয়ার পেতে ঘাসের চটি পরে বারান্দায় বসে রয়েছে। আলো জ্বালা নেই। চুপ করে বসে আছে বাবা। আমি বাবাকে পাশ কাটিয়ে মায়ের ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। মা একটুখানি খিট্‌খিট্‌ করল—আলো জ্বলতেই বাড়ি ফিরতে পার না, একে এই অসুখ শরীর আমার, ভাবি কেবল, তোমার কোন আক্কেল বিবেচনা নেই।

নিজের ঘরে এসে এই কতক্ষণ হল বসেছি। আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাবা বাগানে পায়চারি করছে। আজ আর বাবা বেরুবে না। লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাসি পাচ্ছে বড্ড। বাজিতে আমি তো নিশ্চয় জিতেছি, কিন্তু কাল যদি কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করে—তুই কী করে জানলি মঞ্জু? আমি কী উত্তর দোব? আমি কী বলব যে আমার বাবা কাল বাড়ি ছিল তাই থেকে আন্দাজ করলাম টুলুমাসি নেই। কাজেই বাজি জিতেও আমাকে হেরে থাকতে হবে। মজা কম নয়।

এখন আর লিখতে ভালো লাগছে না। "প্রাণান্তক শিশি' বলে একটা ডিটেকটিভ বই যোগাড় করেছি সেটা পড়ব। অবশ্য অরুণদা শুনলে রাগ করবে। কাল গীতাঞ্জলিটা দিয়ে গেছে আমায়—কিন্তু ও আমার নিজে নিজে পড়তে একদম ভালো লাগে না। অবশ্য ওকে না বললেই হল।

১লা জুন—

ইস্‌ কী সাংঘাতিক শিশিরে বাবা। একফোঁটা বিষ যদি শিশি থেকে জলের

সঙ্গে মিশিয়ে কাউকে খাওয়ানো যায়—দেখতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে শেষ। বড় বড় ডাক্তার বদ্যিতেও ধরতে পারবে না কী করে মরেছে লোকটা। দেড়শ পাতা অবধি পড়েছি এর মধ্যে তিনজোড়া খুন হয়েছে, কিন্তু শিশির মালিককে এখনো ধরা যাচ্ছে না। একটুও যদি আন্দাজ করা যায় তো কী বলেছি। একবার মনে হচ্ছে চীনে ডেন্টিস্টটাই যত নষ্টের গোড়া আবার মনে হচ্ছে, না, মুখে রঙ মাখে মিসেস চাকলাদার ওই বোধ হয়। খালি ইচ্ছে করছে শেষ পাতাটা খুলে একটিবার দেখে নিই, কিন্তু তাহলেই সব মাটি আর পড়তে ইচ্ছে করবে না।

ইলু কিন্তু ডিটেকটিভ বই পড়তে একদম ভালবাসে না। ও যত রাজ্যের নভেল পড়বে। ওর সঙ্গে মিশে মিশে কৌশল্যাও আজকাল ডিটেকটিভ বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পলাশ পড়ে। আমি ওর ওখান থেকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসি। ইলু আবার শুধু নিজে পড়বে না, পড়ে শুনে আমার কাছে আবার গল্প বলা চাই। ও যখন বলে মন্দ লাগে না। কিন্তু আমার ঐ ঘ্যানর ঘ্যানর পড়তে ভালো লাগে না—একটুখানি শুনেই বলি ওকে—যাকগে বল না বিয়ে হল কি হল না শেষ অবধি? ইলু হাসে, বলে—ঐ করলে কি বই পড়া হয়। সেদিন ও কি একটা বই এনেছিল। একটা জায়গা খুলে পড়তে বলল আমায়। আমার তো পড়ে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল—ছিঃ ঐ সব বইয়ে লেখে নাকি। শুধু চুমু খাওয়া বুঝি কিন্তু ওসব কী? একবার দু-বার করে বার পাঁচেক পড়ে ফেললাম জায়গাটা। এত মনটা খারাপ হয়ে গেল! ইলুর জন্যে ভয় হতে লাগল খুব। বেশি বেশি ওইসব বই পড়লে একদম বয়ে যাবে মেয়েটা। এমনিতে ও যা সব কথা বলে যে ওর মুখ চেপে ধরতে হয় মাঝে মাঝে। সে রাতে আর কিছুতেই ঘুম আসে না আমার। কেবল ঐ বইটার কথা মনে পড়ছিল আর ভাবছিলাম কতগুলো নভেল পড়লে তবে টুলুমাসির মত বয়ে যায় মেয়েরা।

ডিটেকটিভ বইয়ে ওসব হাঙ্গামা নেই। শেষে কিন্তু খুনী ধরা পড়বেই। আর ঠিক কানামাছি খেলার মত আমরা সবাই যখন একে ধরছি ওকে ধরছি খুনী যে সে ঠিক এমন জায়গায় আছে যে সবাই তাকে দেখতে

পাচ্ছে অষ্ট প্রহর, কিন্তু ধরতে পারবে না কেউ। শেষকালে তবে সব বোঝা যাবে।

এ বইখানা এখনো একশ পাতা বাকি। এখন বেজেছে নটা। এটুকু লিখে নিয়েই বইটা নিয়ে বসব। সুখদাকে মা একবার জিজ্ঞাসা করল—মঞ্জু কী করছে? সুখদা বলল, লেখাপড়া করছে। কী লিখছি আর কী পড়ব, তা আমিই জানি, ভাগ্যিস সুখদা লিখতে পড়তে জানে না।

অবশ্য এই পড়েও আমার নিস্তার নেই। তারপর গীতাঞ্জলি মুখস্ত করতে হবে। সে ভারি মজা হয়েছে। আমি দুপুর বেলায় 'প্রাণান্তক শিশি' পড়ছি বাইরে ঘরে বসে বসে এমন সময় অরুণদা এল। দুপুর রোদে ঘেমে মুখচোখ লাল করে এসেছে ও। বলল কোথায় গিয়েছিল যেন ফিরবার পথে আমাদের বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ও তো ধপ্ করে বসে পড়ল একটা কুশনে। ফ্যানটা খুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি তখন উঠি কী করে। অরুণদা আসতেই আমি 'প্রাণান্তক শিশি'খানা টপ করে মুড়ে শাড়ির আঁচলে চাপা দিয়ে ফেলেছি। উঠতে গেলেই বইটা নজরে পড়ে যাবে অরুণদার। আমিও তখন ঘামতে আরম্ভ করেছি—কী হবে।

অরুণদা বলল, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম (মিথ্যে কথা, আমার সঙ্গে চালাকি, এখান দিয়ে যাচ্ছিলে নয় এখানেই আসছিলে) ভাবলাম কী করছ দেখে যাই। কী করছিলে? পড়ছিলে? আমি বলব কী পড়ছিলে? গীতাঞ্জলি, ঠিক না?

হায় ভগবান। আমি কী বলি এখন। বললাম—আচ্ছা তুমি কী বলত অরুণদা ঘামছ, মাথার কাছে সুইচটা টিপে দিতে পারছ না একটু।

অরুণদা যেই মাথাটা ঘুরিয়ে সুইচটা টিপে দিতে যাবে আমি অমনি বইটা কুশনের তলায় চালান করে দিতে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অরুণদা মাথা ফিরিয়ে দেখতে পেয়েছে, আমি কী করছি—সর্বনাশ!

ও বলল—কী লুকুচ্ছ, মঞ্জু বইটা? লুকুচ্ছ কেন? বলে এগিয়ে এসে বইটা টেনে বার করল অরুণদা—'প্রাণান্তক শিশি', আমার তখন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। আর অরুণদার মুখখানা ঠিক প্যাঁচার মতন হয়ে গেল। তারপর ও আর ঠিক দু-মিনিট ছিল। বুঝতেই পারছি খুব রেগে গেছে।

ভোগান্তি আর কাকে বলে। এখন আমি এই 'প্রাণান্তক শিশি' শেষ করব

তারপর গীতাঞ্জলি খুলে বসব। দুটো পদ্য মুখস্থ করতে হবে। জ্বালা কম। কোন্ দুটো আবার করি দেখি। ভারততীর্থটা মুখস্থই আছে। ওটা আমাদের পাঠ্য। কিন্তু ভারততীর্থ মুখস্থ করলে কি মনে ধরবে অরুণদার? মনে হয় না তো।

২রা জুন, ১৯৫৫—

বিচ্ছিরি দিন। সমস্ত শরীরে অস্বস্তি। শুয়ে আছি সারাক্ষণ। কেমন যেন হিজিবিজি লাগছে মাথায়। একে একদম গোলমাল সহ্য করতে পারছিলাম না—শব্দ কানে এলেই রাগ হচ্ছে, তার ওপর সুখদা সকাল বেলায় দুটো প্লেট ভাঙল কাঁচের। বুড়ি কোন কাজের না। খাওয়া আর সব তাতে নাকনাড়া ছাড়া সুখদাকে আর কিছুতে যদি পাওয়া যায়। সকালবেলায় ইলু এসেছিল। ক-দিন ও আসতে পারেনি, চিংড়িমাছ খেয়ে পেটের অসুখ করেছিল বলে। ইলু এসেছিল বটে—কিন্তু আমার একটুও ভালো লাগছিল না। ও কী ভাবল কে জানে, চলে গেল একটু বাদে। আজ আমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে। সুখদাকে খুব খানিকটা একহাত নিলাম। হট ওয়াটার ব্যাগ আনতে বলেছি সকাল থেকে বোধ হয় সাত বার। জল ভর্তি করে আনল যদিবা ছিপিটা ভালো করে বন্ধ করেনি—বিছানায় জল পড়ে ভিজে এ্যাকসা। রাক্ষসী মাগীর ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে। এই ফাঁকে আবার অরুণদা এসেছিল—সুখদাকে বলে দিলাম, বলগে যা ভীষণ মাথা ধরেছে, সারিডন খেয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি মরছি নিজের জ্বালায় উনি এলেন ভ্যাজারাম ভ্যাজারাম করতে।

৩রা জুন—

এক এক সময় আশ্চর্য লাগে বড়। কেউ কিচ্ছু আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। ইলু নয়। কৌশল্যা নয়। পলাশ নয়। অরুণদাও নয়। ঘুরি ফিরি হাসি খেলি কিন্তু বুকের মধ্যে কী যেন একটা কাঁটা সব সময় খচ খচ করে। সে কাঁটা আমার উপড়ে ফেলার কথা নয়। আমি পারিও না। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারদিক নিথর। একটি পাতা নড়ছে না গাছের। রামবিরিজের ঘরের কাছে একরাশ ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। মেঘে ঢাকা আকাশে একফোঁটা তারা নেই।

এতক্ষণ জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরের আলো নিভিয়ে রেখেছি। বাবা এই খানিক আগে ফিরল। বাবার খাবার বাবার ঘরের টেবিলে রাখা আছে। এত রাতে বাবা একা খাবে বসে বসে। এত রাত অবধি আমি কোন দিনই জেগে থাকি না। আজ যখন আছি ভাবলাম যাই একবার বাবার ঘরে।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে মায়ের ঘর দিয়ে বেরিয়ে এলাম এদিকের বারান্দায়। ঘাস রঙের মোজেকের মেঝেয় চোখ রেখে বাবার ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাবা বললেন—মঞ্জু মা, ঘুমোওনি। ঘাড় নেড়ে বললাম, না। বড় আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিলাম। নীল ফ্রকটার ওপর কালো কুচকুচে বিনুনি পড়ে রয়েছে। একটু হেসে বললাম—কত রাত যে কর বাবা।

বাবা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললেন—তুই আজ জেগে আছিস যে ?

বললাম—ঘুম পাচ্ছে না কিছুতে বাবা।

বাবা বললেন—চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে শুয়ে পড়গে যাও। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন—পড়াশুনা করছিস ঠিকমত ? প্রিটেস্ট কবে ?

—পূজোর আগে। পড়াশুনো ঠিক হচ্ছে না বাবা।

থালা থেকে মুখ তুলে বাবা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন ?

—পড়ায় মন বসে না বাবা, একটুও বসে না।

—কেন মায়ের অসুখ বলে ?

—মায়ের অসুখ বলে আর—

—আর ?

—আর তুমি একটুও বাড়ি থাক না বলে।

থালা থেকে মুখ তুলে বাবা আমার দিকে তাকালেন। বললেন—কী বলছিস ? টেবিলে ফ্রেম-নেই আয়নায় আমার ছায়ার দিকে আমার চোখ পড়ল। আমাকে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। তখন গলাটা শুকিয়ে গেছে মনে হল। ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিলাম। বললাম—তুমি আজকাল বড্ড কাজে ব্যস্ত বাবা।

বাবা দুধের বাটিটা টেনে নিলেন। চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন। যাক বেঁচে গেছি, খুব পাশ কাটানো গেছে।

দূরের বুড়োবুড়ি পাহাড় চমকে চমকে উঠছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছিল এতক্ষণ এখন যেন সেগুলোও থেমে গেছে। এক আকাশ মেঘ। তার তলায় নিথর রূপসাডিহি ঘুমুচ্ছে। আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গেটের বাইরে সামনের ফাঁকা রাস্তাটাও যেন ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে। বাবার কথায় সাড় ফিরল।

বাবা বললেন—ঝড় উঠবে মঞ্জু, ঘরে যাও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি মায়ের ঘরে যাবে না বাবা?

বলেই মনে হল বোধ হয় বলা ঠিক হল না। ভীষণ লজ্জা করতে লাগল।

বাবা বললেন—না।

না? না কেন? আমার খুব রাগ হতে লাগল শুনে। মা হয়তো এখনো জেগে বসে আছে তোমার জন্যে আর তুমি বলছ না। বাবা, তুমি তো বেশ, তোমার কি মন বলে কিছু নেই, তোমার কি মায়া হয় না? একটুও না?

কিন্তু মুখে কিছু বললাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কেন যাবে না মায়ের ঘরে?

বাবা বললেন—মঞ্জু, সব কথায় ছোট মেয়েকে কথা বলতে নেই, যাও ঘরে যাও।

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম বাবার ঘর থেকে। অন্ধকার বারান্দায় একটু চুপ করে দাঁড়ালাম। না, কান্না আসছিল না। ঘাড় মাথা কেমন গরম লাগছিল। বাবা চলে আসতে বলল আমায়। ঠিক আছে। কিছু করার নেই। কোনদিন বাবা একথা আমায় বলেনি, এত মুখ ভারি করে কথা আমায় কোনদিন বলেনি। মা বকে কখনো সখনো। কিন্তু বাবা কখনো না। আজ প্রথম।

মায়ের ঘর হয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। মা এখনো জেগে রয়েছে। আমি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই মায়ের মুখটা কেমন জ্বলে উঠেই নিভে গেল। মা বোধহয় মনে করেছিল বাবা এল। মা বলল, ঘুমোসনি, কোথায় ছিলি?

বললাম, বাবার ঘরে। বাবা শুয়ে পড়েছে।······মাকে বলব, বাবা কী বলেছে আমায়? বলব? না থাক, এমনিই তো দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে আসছে, আমার দুখ্যু আমারই থাক, বলে কাজ নেই।

মা বলল—মঞ্জু, ঝড় আসবে বোধহয়, জানলাটা খুলে দে।

জানিস কৌশল্যা, জানিস ইলু—আমার মুখ দেখে তোরা কিছু বুঝতে পারিস না।

তোরা হাসিস, আমিও হাসি, কথা বলিস আমিও বলি। কিন্তু হাসির তলায় আমার মুখটা পুড়ে গেল। অপমানে আর লজ্জায়। সে কথা তোরা জানিস না। জানিসনে বলেই বুঝতে পারিসনে যে কেন আমার টুলুমাসিকে দেখলেই আঙুল মটকাতে ইচ্ছে করে। দিন কতক জ্যাক বলে আমাদের বাড়িতে একটা কুকুর জুটে ছিল। কোত্থেকে এসেছিল জানি না তবে কুকুরটাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। বাবা কুকুরটাকে চান করাতো, পাউডার মাখাতো, এমন কি বিকেলবেলা আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় সেটাকেও নিয়ে যাওয়া শুরু করল। আমার তখন ন-দশ বছর বয়স। আমি বাবার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই কুকুরটা কোথা থেকে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে মাঝখানে এসে দাঁড়াতো আর বাবা অমনি কুকুরটার গায়েই হাত বুলুতে শুরু করত। আমার মাঝে মাঝে ভীষণ ইচ্ছে করত যে খুব করে ঘি খাইয়ে কুকুরটার সব লোমগুলো উঠিয়ে দিই। টুলুমাসির বেলাতেও আমার ইচ্ছে করে যে সকালবেলায় একদিন বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টুলুমাসিকে দেখিয়ে আসি। একবার দেখুক বাবা যে টুলুমাসির মুখের সকালবেলার রঙ আমার সকালবেলার রঙ এ দুয়ের মধ্যে কোনটা ফল্‌স্‌। টুলুমাসির চেয়ে আমি অনেক ভালো একথা বাবা জানে? ছাই আর পাঁশ, বাবার কিছু বোঝার সামর্থ্যই নেই।

৪ঠা জুন, ১৯৫৫ সকাল--

ঝড় উঠেছিল কাল রাত্রে। রাত তখন কত হবে কে জানে। বিছানায় শুয়ে উল্টোদিক থেকে একশ গুণছিলাম। যদি ঘুম আসে। ঘুম কিছুতেই আসছিল না, নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল। কী দরকার বাবার সঙ্গে ও সব পাকামি করবার। তারপর কখন তন্দ্রা এসেছিল জানি না। মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি গাছপালাগুলো হুড়োহুড়ি শুরু করেছে বাগানে। বিদ্যুৎ চকচক করে উঠছে আকাশে। কালো শেলেটের মতন আকাশে কে যেন চকখড়ির দাগ লম্বা হাতে টেনে দিচ্ছে আর মুছে দিচ্ছে। কাঁকর ছিটিয়ে পাতা উড়িয়ে নৈ-নেত্য করে দিল ঘর দোর, বিছানা ভরিয়ে দিল ধুলায়। দেবদারু গাছ মাথা ঝুঁকিয়ে জামরুল গাছের কাঁধে হাত দিতে যাচ্ছে। ভয়ে জামরুল গাছ জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে পেঁপে গাছকে। সাদা ইউক্যালিপটাস

ঝকমক করছে বিদ্যুতের আলোয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম ফোঁটা ফোঁটা বিষ্টির ছাট লাগল গালে। রামবিরিজ ঘরের বাইরে খাটিয়া পেতে শোয়। খাটিয়া তুলতে তুলতে বলল—খোঁকিদিদি জানলা বন্ধ করে দিন। 'তুমি যাও, দিচ্ছি' বলে জানলা খোলা রেখেই ঝড় দেখতে লাগলাম। পরীহাটির মাঠের একমাঠ কৃষ্ণচূড়া আজ উড়ে যাবে। আমাদের জামরুল গাছের শালিখের বাসা আজ ভেঙে যাবে। কী ঝড় হচ্ছিল। ঝড় এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার চুল। ঠাণ্ডা হাওয়া উড়িয়ে দিচ্ছিল আমার ফ্রক—এখনো আমি ফ্রক পরেই শুই—হাত বুলুচ্ছিল আদর করে সারা গায়ে। এক কোণে মেঘ ফেঁসে গেল, ভারি মজা লাগছিল দেখতে। ওদিকে দেখি বাবার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। জানলা দিয়ে বাবা আমাকে দেখতে পেলেন—বললেন, মঞ্জু ঘরের মধ্যে যাও। বললাম বাবা, জামরুল সব পড়ে গেল।

বাবা বললেন—আচ্ছা সে কাল হবে, এখন যাও।

গেলাম না। বাবার চোখ এড়িয়ে একটু পিছিয়ে এসে দেখতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় যাত্রাদলের সেনাপতির মতন গোড়া ভেঙে ধড়াস করে পড়ল পেঁপে গাছটা। এমন দিনে আমার সেই রাতের কথা মনে পড়ে। সেই সব্বনেশে রাত। সেও এমন ঝড় বাদলা দুর্যোগ। কত রাত অবধি আমি কোলবারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম সুখদার সঙ্গে। মা গিয়েছিল ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে। ফেরার কথা ছিল সন্ধ্যেয়। মাঝরাতে তারা মায়ের অজ্ঞান দেহটা স্ট্রেচারে চড়িয়ে নিয়ে এল—তখন আমার মাথার মধ্যে ঝড় উঠেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তখনো না, হাসপাতালে মাকে যখন দেখতে গেলাম তখনো না।………………শুকনো পাতা ঘুরপাক খাচ্ছে আকাশে, পাখিগুলো ভয়ে গাছ ছেড়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। ক্রিং ই-ই-ইং করে মায়ের ঘরের কলিং বেল বেজে উঠল। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখি সুখদা রয়েছে, আমাকে বলল—মায়ের কাছে বোস। আমি নিচেটা একবার দেখে আসি। মায়ের বাঁ দিকে ঘরের জানলা খোলা, মা চেয়ে আছে—বাইরের দিকে—দূরে, অনেকদূরে বুড়োবুড়ি যেখানে চমকে উঠছে সেই দিকে। মনে হল মা যেন কতদূরে চলে গেছে, সেই কোথায়, মনে হল মা ডাকলে আর সাড়া দেবে না। ভয় করছিল কললাম—মা। চটকানা ভেঙে মা ফিরে তাকালে, বলল—মঞ্জু ভয় করছে?

মায়ের মুখে ভয় করছে শুনে আমারও ভয় করল কেমন। মায়ের কোলের কাছে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

৫ই জুন—

রামবিরিজ আর সুখদা যখন গল্প করে শুনতে বেশ মজা লাগে। রামবিরিজ খৈনি ডলতে ডলতে কথা কয় আর ওর কালো পেল্লায় ভুঁড়িটা দুলতে থাকে। কালো ভুঁড়ির ওপর হলদে পৈতেটায় বাঁধা চাবিটাও তখন দুলতে শুরু করে। সুখদা আর রামবিরিজ কে বেশি মোটা এ নিয়ে আমি আর কৌশল্যা এখনো তর্ক করি। ইলুর এ তর্ক বিশেষ ভালো লাগে না বলে ওর সামনে রোগা মোটার তর্ক তুলি না। তবে সুখদা যে কী মোটা দিন দিন হচ্ছে তা লিখে বোঝানো যায় না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে মা ওকে এগারো হাত শাড়ি কিনে দেয়, তাতেও ওর আঁচলে শর্ট পড়ে।

সুখদা বলে—মুয়ে আগুন শতেক খোয়ারির একটা সোয়ামীকে খেয়েছ, খেয়ে নোলা জুড়োয়নি আবার একটা নিকে করেছ। তাও করেছিস করেছিস বেশ করেছিস মাথার সিঁদুর ঘষে ফেলে এখানে এসে লীলে শুরু করা কেন? সেদিন মঞ্জুর জন্মদিনে কী হেসে হেসে ঢলানিপনা, দেখলে গা জ্বলে যায়।

রামবিরিজ বলে—আরে ছোড়ো ও বাত, হামি লোক কোঠির নোকর আছি, হামি লোকের কী কাম আছে কে সিনুর লাগাল কে উঠাইল।

সুখদা বলে—আমার যে ঐ এক জ্বালা কিনা, অসৈরণ সৈতে পারিনে।

ততক্ষণে রামবিরিজের খৈনি ডলা শেষ হয়েছে। এক চিমটে খৈনি তুলে সুখদার দিকে বাড়িয়ে ধরল, বলল—লেও লেও খৈনি চড়াও।

সুখদা ঠিক, বলব কি ব্যাটাছেলেদের মতন করে ঠোঁট বেঁকিয়ে খৈনিটা নিচের ঠোঁটে গুঁজে দিল। এমন রাগ হচ্ছিল দেখে।

রামবিরিজ বলল—রামজিকো কিরপাসে হামলোগোঁকো মনুষ্য জনম মিলা। কোই কোই আদমি হো কর আদমিকো মাফিক শোচতা নেহি, সমঝ্তা নেহি। ওয়াদিয়া সাব আউর টুলুমাসির নতিজা আচ্ছা হোবে না।

সুখদা বলল—তুমি তো সব জান, ভুঁড়িদাস বাবাজী।

রামবিরিজ বলল—তুমি সব জানে? রসুই ঘরসে ছিপায়কে ছিপায়কে সব কুছ

খাতে খাতে সব কুছ জানতা হায় তোম।

আমি জানি এইবার ঝগড়া বেধে যাবে। সুখদা বলবে, তুই বেটা ভাঙখোর, ভাঙখোরের মতন থাক, রামবিরিজ হাসবে আর ওকে রাগাবে। তারপর সংসারের কাজকম্ম থৈ থৈ করবে। আমি এগিয়ে গিয়ে রামবিরিজকে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিলাম সুখদাকেও বকলাম—ব্যাটাছেলের মত খৈনি খাওয়া ধরেছ আবার কবে থেকে ?

সুখদা বলল—তুমি কি আমার ইস্কুলের দিদিমণি নাকি, সব কাজ তোমায় জানিয়ে করতে হবে।

আমি বললাম—বেশ, খৈনি খাওয়া যখন ধরেইছ, আর চেহারার আড়া যখন রামবিরিজের মতন, তখন রামবিরিজ ছুটি নিলে তুমি লাঠি কাঁধে করে বাড়ি পাহারা দেবে, আমি লোককে বলব রামবিরিজের দাদা বদলি খাটছে।

সুখদা খচে বোম্। বলল—বেশ, তাই যাও।

আমি বললাম—হ্যাঁ, রামবিরিজের মত নাইকুণ্ডু বার করে, মাথা ন্যাড়া করে কিন্তু।

সুখদা বলল—আমি দিদির কাছে যাচ্ছি, তোমার বড্ড মুখ হয়েছে।

আমি বললাম, যাও গে যাও।

রামবিরিজকে বাজারে পাঠিয়ে আমি একটু পড়তে বসতে যাব এমন সময় ইলু এল। আজ কথাই ছিল দুজনে স্কিপিং করব। নইলে গরমের ছুটিতে বসে বসে মুটিয়ে যাব।

ছাপ্পান্ন···সাতান্ন···ষাট···চৌষট্টি। ইলু দড়ি ফেলে দিয়ে বলল—আর পারছি না। ও জামরুল তলায় বসে হাঁপাতে লাগল। আমি আঁচল কোমরে বেশ করে জড়িয়ে দড়িটা কুড়িয়ে নিলাম। আমি ইলুকে অনেক ছাড়িয়ে গেলাম। একেবারে একশ আটাশে গিয়ে থামলাম। ইলু বলল—গোঁফ হয়ে গেছে, মুছে ফেল। কোমরের আঁচলটা খুলে মুখের ঘাম মুছে ফেললাম। বললাম—তাও তো শাড়ি পরে অসুবিধা হয়, ফ্রক পরে থাকলে দেখতিস। ইলু বলল—তা নয়, তোর শরীরটা খুব হালকা তো। আর আমি দিন দিন ফুলছি। আমি একটু সরে বসলাম। তা না হলে ‘হালকা তো’ বলেই ইলু এক্ষুনি জড়িয়ে ধরবে

আমায়—ঐ ওর এক রোগ। আর গায়ে হাত দেওয়া আমি ছুটি চক্ষে দেখতে পারিনে।
আমি বললাম—তুমি যে গেলো বড্ড বেশি।
—হ্যাঁ গিন্নি। আর তোরা সব নিখাকির মা।
তখন সকাল বেলা।
সূর্যমুখীর তলায় কোথা থেকে উড়ে আসা এক ঝাঁক টিয়া কলমল করছে। জামরুল গাছের নিচেয় একটু-একটু ঘাসের ওপর উবু হয়ে বসলাম দুজনে। শুরু হল একথা, ওকথা সেকথা। এ গল্প ও গল্প সাত গল্প। ইলু যখন কথা বলে তখন আমি ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটি আর শুনি। আবার আমি যখন কথা বলি তখন ও ঘাস চিবোয়। কথা বলতে টিয়াপাখির কলমল কখন হারিয়ে গেছে টের পাইনি। জামরুল গাছ ছায়া সরিয়ে চড়া রোদ খানিকটা আমাদের মুখের ওপর ফেলল। দুজনে উঠে পড়লাম।
ইলু বললে—জানিস, পলাশের একটা ভাই হয়েছে আজ দু-দিন হল।
আমি বললাম—সুখদা বলল ও শুনেছে বোন হয়েছে পলাশের।
ইলু বলল—ভাগ্‌ আমি কাল মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে ওদের বাড়ি। নিজের চোখে দেখলাম বাচ্চাটাকে পলাশের মাসির কোলে। ভাই হয়েছে। পাউডার মাখাচ্ছিল তখন। খুব ফর্সা হবে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা ক-ভাই বোন সব সুদ্ধ হল?
—সাত ভাই বোন, এই বাচ্চাটাকে ধরে।
—এত ভাই বোন বিচ্ছিরি লাগে, না?
—ওদের প্রথমে এক ব্যাচ ছেলে, পলাশ, বিলটু, সোনা, তারপর এক ব্যাচ মেয়ে মিমি, পিপি, ডুলা আবার বোধ হয় ছেলের ব্যাচ শুরু হল।
—বাড়িতে অত ভিড় হলে ঠিক মরে যেতাম আমি।
—হাড় জুড়ুতো সবায়ের, নাও এখন থাকো তুমি আমি চলি। কাল আমি থাকব না, আসানসোল যাব মায়ের সঙ্গে। পরশু লুডো নিয়ে আসব এখন।
ওখান থেকে এক লাফে মায়ের ঘরে এলাম।—জানো মা পলাশের আবার একটা ভাই হয়েছে। মায়ের শুকনো মুখখানা যেন জ্বলে উঠল খুশিতে—ওমা তাই নাকি? কবেরে? আমি মায়ের খাটে বসে পা ঘষতে লাগলাম মেঝেয়। মায়ের

সাদা কণ্ঠার হাড় দুখানার দিকে তাকালে কেমন মায়া হয়। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম মায়ের গলার কণ্ঠায়। বললাম—এত ভাই বোন ভালো নয়। মা একটু হেসে বলল—তোমার মত একেলষেঁড়ের পক্ষে তো নয়ই। ছোটবেলা থেকে তুমি ঐ রকম। কারুর ভাই হয়েছে কি বোন হয়েছে শুনলেই তোমার মুখভার হত, পাছে তোমার হয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করেছ আমায় তুমি। আমি ততক্ষণে মায়ের বুকে মুখ গুঁজেছি। আর কথা বলে।

৬ই জুন—

কাল দুপুরবেলায় গরম কম ছিল। আগের দিন রাতে উপুরঝান্তি বিষ্টি হয়ে গেছে। দুপুরে বাগানে গাছতলায় বেতের টেবিল চেয়ার পেতে পড়তে বসেছিলাম। গরমের ছুটির আগের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নম্বর কম হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যে ইংরেজিটা বেশি করে পড়ব মনে করেছি। ইংরেজিতে কৌশল্যা খুব ভালো। ইলু? সেকথা আর বলে কাজ নেই, ইংরেজি ভূগোল দুটোতেই গাঁচ্চা খেয়েছে। রমলা ভূগোলে আবার ফার্স্ট হয়েছে।
ট্রানশ্লেসন করব কী? মন দিতে পারলে তবে তো করব। একটা কাঠবিড়ালী কুটকুট করে জামরুল খাচ্ছিল, কী সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন ঠিক ছোট্ট ছেলে দাঁত দিয়ে বাদাম কাটছে। কাঠবিড়ালী দেখতে বড় ভালো লাগে যেন টেনিস কোট পরা ধীরেনকাকু। একটা নাম জানি না খয়েরী পাখি গাছ থেকে উড়ল। আবার ফিরে এল। কী খেলা? ট্রানশ্লেসন করছি দেখতে পাচ্ছে না? একটা বেড়াল এল আর কাঠবিড়ালীটা ভোঁ দৌড়। ভাবলাম যাক্ এবার এই প্যাসেজটা করে ফেলি। ট্রানশ্লেসনে প্রিপোজিশন ঠিক করাই মুশ্‌কিল। 'ইন' না 'টু' না 'ফর'। আমি আবার বেশি বেশি 'ফর' দিয়ে ফেলি। বীণাদি বলেন—সফরী ফরফরায়তে। সবাই হাসে, সেজন্যে মরে গেলেও 'ফর' লিখি না আর। অরুণদা খুব ভালো ইংরেজি জানে। অরুণদা···
ধমক দিলাম মনকে—পড়ার সময় যত বাজে কথা। মনটাকে ঠিক করে নিয়ে খাতায় ঝুঁকে পড়লাম। একটা ছিল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। টেন্সের গোলমাল? সে আর বলতে—ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। কী বলেছিল বীণাদি—প্রিন্সিপ্যাল ক্লজে যদি ভার্ব পাস্ট টেনস হয় সাবোর্ডিনেট ক্লজেও

তাই হবে। প্রিন্সিপ্যাল ক্লজের ভার্ব তাহলে আসল—লিখে ফেলতে ফেলতে ভাবছিলাম আমাদের বাড়িতে প্রিন্সিপ্যাল ক্লজ মা না বাবা? মা যদি হয় তাহলে বাবা প্রিন্সিপ্যাল ক্লজকে ফলো করছে না কেন? নাকি বাবা প্রিন্সিপ্যাল ক্লজ কে জানে? মোট কথা ভুল সেন্টেন্স হয়ে রয়েছে একটা এখানে—এই অশ্রুনিলয়ে। চুলোয় যাক্—আমার কিছু হবে না এই ভেবে আবার মন দিলাম। পরেরটা ছিল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট টেন্স। তাহলে ভার্ব একটা 'এস' সঙ্গে নেবে। সিঙ্গুলার নাম্বার কিনা, বড় ক্যাঙলা, প্লুরালের 'এস'-এর দিকে বড় লোভ তার, তাই যেন-তেন করে ভার্বের সঙ্গেও একটা 'এস' নেবে সে। ভারী লোভী তো? ঠিক যেন টুলুমাসি। ওই আমার বড় দোষ। আমি কোন কাজ একমনে গুছিয়ে করতে পারিনে। মা ঐ জন্যে কত বকে। কে শোনে সে কথা। একটা কাজ করতে করতে আর একটা কাজের কথা মনে পড়বে। সেটা করতে গেলে আবার আর একটা। সত্যি কথা বলতে কি আমার ইচ্ছে করছিল 'নিশীথ রাতের হত্যাকারী' বলে একটা বই এনেছি সেটা পড়তে। কিন্তু জোর করে পরের সেন্টেন্সটা করলাম। সেটা তো গেল। তার পরেরটা করাই ছিল। রামের আজ স্কুলে যাইতে মন নাই, Ram does not feel like going to school to-day. তারপর feel like দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখলাম। বীণাদি বলেছেন যেটা নতুন শেখা যায় সে কথাটা দিয়ে দুটো নতুন বাক্য রচনা করবে। আমিও একটা লিখলাম—I do not feel like speaking with টুলুমাসি। তারপর গুড়ে বালি আর কিছু হল না, কৌশল্যা এল। কৌশল্যা বেনারস গিয়েছিল ওর কে আছে সেখানে। আমি ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলাম—ওমা তোর হাতে কী রে?

—ছায়া জগৎ।

—নতুন নাকি?

—হ্যাঁ এই দেখ্ না। বিশাখা আর চঞ্চলকুমারের ছবি।

—ওমা ইস্ তাইতো ভারি সুন্দর উঠেছে কিন্তু। যাই বলিস বিশাখাকেই দেখতে বেশি সুন্দর না? কী রকম ফাইন ফিগার। ইলু বলে চঞ্চলকুমারকে—আমার একটুও ভালো লাগে না, কী মোটামোটা ঠোঁট আর বোকা

বোকা হাসি। আর কখনও পড়া হয়। দুজনে ফিল্মিস্তান দেখতে লেগে গেলাম।

বললাম—বেনারস গিয়েছিলি সারনাথ দেখলি?

—সেই কথাই তো বলতে এলাম, তোকে না বললে পেট ফুলবে না? সকালে পৌঁচেছি দুপুরেই তোর কাছে এলাম। সারনাথ তো গেছি, জানিস গিয়ে দেখি কী ভিড়, কী ভিড়, কী ব্যাপার? না চঞ্চলকুমার আর বিশাখা। বোঝ—বলে ও আমার গায়ে ঠেলা দিল।

—যা মিথ্যুক।

—এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি সারনাথ তো মাথায় উঠল। আমি ভাবলাম আজ দেখতেই হবে যা করে হোক, সারনাথ তো কতই যাব আবার, বল এ্যাঁ, কিন্তু বিশাখা আর চঞ্চলকুমার একসঙ্গে, এ ভাগ্যে হয়, বল—ভিড়ে খোঁপা খুলে, শাড়ি ছিঁড়ে দেখলাম জানিস। ঠিক ছবির মতন ভাই, কী বলব তোকে আর।

শুনে আমার এমন মন খারাপ হল—আমি দেখতে পেলাম না।

কৌশল্যা বলল—ইলু তোকে চিঠি দিয়েছে। ও ইলুদের বাড়িও গিয়েছিল আমায় বলল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ইলুর চিঠির একটা জবাব লিখে দিলাম। কৌশল্যা চিঠিটা ব্লাউজের মধ্যে পুরে রাখল। আমি বললাম যেন ভিজিয়ে ফেলিসনি। তারপরেও কৌশল্যার বকর বকর কি থামে। ওর বেনারসে কে এক ছোটকাকা আছে, সে হেন সে তেন এই গল্প শুরু করল। বলল—ছোটকাকার কাছে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছি শুনবি? বলে গাইতে লাগল—

সব যে দিতে হবে সে তো জানি সে তো জানি
আমার সকল বিত্ত প্রভু আমার সকল বাণী

ও বলল—এটা ভক্তির গান জানিস।

বললাম—আমায় শিখিয়ে দে গানখানা। খুব ভালো লাগছে। ও আস্তে আস্তে গাইতে লাগলো আমিও ধরলাম। কৌশল্যাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তখন রোদ জামরুল গাছের ফাঁক দিয়ে ওর মুখে পড়ছিল। একটু একটু ঘামছে আর গানখানা আমায় শেখাচ্ছিল—

আমার চোখে চেয়ে দেখা আমার কানে শোনা।
আমার হাতে নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা।

……ভীষণ ভালো লাগছিল গানখানা—সুখদা ধুমসি সেই সময় ওপর থেকে চেঁচাতে শুরু করল, মঞ্জু চুল বাঁধবে এস। এক তাড়া দিলাম, চুল বাঁধব না ভাগো। গানখানা লিখে নিলাম। একটু একটু গাইতেও শিখলাম। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। সুখদা যখন বাবার জন্যে কফি করেছিল, না বলে আমিও এককাপ খেয়েছি কিনা তাই। ওঘরে মায়ের পায়ে সুখদা মালিশ করছিল আর নিচু সুরে কথা বলছিল কী সব। ঘুম ছিল না আমার চোখে। অন্ধকার ঘরে পাখা চালিয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিলাম। বিকেলে বিনুনিতে একটা লাল গোলাপ ফুল গুঁজে ছিলাম। শোবার সময় ফুলটা খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিছানাময় বিশ্রী দাগ হয়ে গেল, ভাগ্যিস সিল্কের ব্লাউজটায় দাগ লাগেনি…কিন্তু গোলাপ ফুলের গন্ধে মনটা কেমন কেমন করে উঠল।

ঠিক তারপরেই অরুণদার জন্যে মন কেমন করে উঠল বড্ড। নিজের হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিলাম। গানটা গাইতে ইচ্ছে করছিল। শেষটা তবু অন্ধকারে গুন গুন করে উঠলাম—সব যে দিতে হবে সে তো জানি সে তো জানি। কৌশল্যা বলেছে- এটা ঠাকুর দেবতার গান। তাঁদের কথা মনে করে গাইতে হয়, ওর ছোটকাকা বলেছে। গান গাইতে গাইতে দেখি ঠাকুর দেবতার কথা মন থেকে হারিয়ে গেছে সে জায়গায় যে এসে দাঁড়িয়েছে সে অরুণদা। খানিকটা বাদে শুনি সুখদা বলছে, মঞ্জু মা শুনবে এখানে এসে চেঁচিয়ে গাও। আমি মাকে শোনাব বলে ওঘরে গিয়ে গলা ছেড়ে দিয়ে গাইতে লাগলাম। একটু পরে পায়ের শব্দে বুঝলাম বাবা এসেছে ঘরে। গান শেষ হলেই যে বাবা চলে যাবে তাই আমি সমস্ত গানটা ফিরে ফিরে গাইলাম। গান শেষ হয়ে গেল তবু। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কার গান এটা অশ্রু? মা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের তাকিয়ে রইল চুপ করে। আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথের। অন্ধকারের দিকে মা তাকিয়ে রইল, আমি তাকালাম বাবার দিকে আর বাবা তাকিয়ে রইল দরজার দিকে তারপর আমরা তিনজনেই চুপ করে রইলাম। আমার দু-বছর আগের

কথা মনে পড়ল। বাবা কাজ থেকে ফিরে এলে বাগানে গোল টেবিল চেয়ার পেতে মা বাবা বসত, আমি আবৃত্তি করতাম, বাবা গল্প বলত, মা গান গাইত। সে সব দিন এবাড়ি থেকে এক বছর হল হারিয়ে গেছে। হে ভগবান আর ফিরবে না? কক্ষনো ফিরবে না?

৮ই জুন—

ইলু, বিলু আর ওর মা বাবা আসনসোল গেল। ওখান থেকে কোলিয়ারি দেখতে যাবে ওরা। আমাকেও বলেছিল ইলু। আমি বললাম—না। আহা! ওর মা-বাবার আদর খেতে খেতে ও যাবে আমি কেন তার সঙ্গে যাবো। আমার বাবা নিয়ে যেতে পারে না? মায়েরই না হয় অসুখ করেছে বাবা তো আছে। অবশ্য বাবার সময় কোথায়? নিজে থেকে বললে হয়তো হয়। কিন্তু তা কেন আমি বলতে যাব? তোমার চোখ নেই, দেখতে পাও না। এই যে লম্বা ছুটি যাচ্ছে গরমের, একা একা এত বড় বাড়িতে দমবন্ধ হয়ে মরছি—একটু জিপে করে নিয়ে বেড়ালে কী লোকসানটা হয়?
বাবা বলে বিকেলে রামবিরিজকে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ি থেকে একটু আধটু ঘুরে এলে পারো। আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি যে সন্ধ্যাবেলায় আমি লোকের বাড়ি বেড়াতে যাব। যেখানেই যাব দেখব যে তাদের বাড়ির বারান্দায় কি লনে যে যার বাবা মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে। আমি গেলেই দুটো কথা হবে প্রথমে। মা কেমন আছে আর বাবা কোথায়? প্রথমটার জবাব যদি বা দেওয়া যায়, দ্বিতীয়টার জবাব মিথ্যে ছাড়া রাস্তা থাকে না, বলতে হয়—জানি না। কাজেই কোথাও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আগে আগে মা বলতো বাবাকে—মঞ্জুকে একটু আধটু বেড়াতে নিয়ে যেতেও তো পারো। মঞ্জু? টুলুমাসির সঙ্গে একই জীপে? তার চেয়ে দোলনার দড়িটা খুলে গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়লেই হয়। অবশ্য মা ইদানীং বাবাকে আর সেকথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।
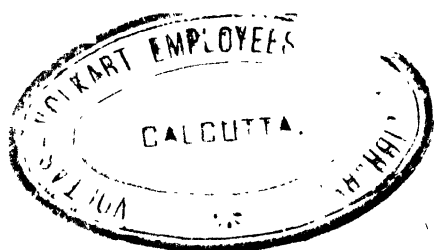
(অরুণদাকে লেখা চিঠি)

(কোন তারিখ নেই। চিঠির আকারে এ অংশটুকু লেখা)

অরুণদা,

আজ আমি তোমার ওপর খুব রাগ করেছি। তুমি অমন করবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করা একদম ভালো নয়।—একথা মা কেবলই বলে। ওটা রান্নাঘরের পিছন। ওই জানলাটা দিয়ে সুখদা প্রায়ই পানের পিক ফেলতে মুখ বাড়ায়—যদি দেখে ফেলত! তুমি তো তারপর চলে গেলে। আমি ভয়ে ভয়ে মরি। সুখদার চোখে চোখ রাখতে পারছি না। সারাদিন মায়ের ঘরে একবারও ঢুকিনি। আমার মনে হচ্ছে যেন সবাই দেখে ফেলেছে সবাই জানে। সেই থেকে একা একা ঘুরছি। ইলু এল। কত কথা বলছিল—ও ডিমের হালুয়া করতে শিখেছে। আজ করেছিল। কিন্তু ভালো হয়নি কেমন আঁসটে গন্ধ হয়ে গেল। কেউ খায়নি —ও একাই খেয়েছে সবটা। বেশ করেছে—কিন্তু আমার তখন ওসব কথা শুনতে একদম ভালো লাগছিল না।

যাই বল আচমকা আমার মুখখানা তুলে ধরে তুমি চুমু খাবে জানলে আমি তোমায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে যেতাম না। সারা সকাল আমি বসেছিলাম তুমি আসবে বলে। দুটো কবিতা মুখস্থ করে রেখেছিলাম—সেকি ঐ জন্যে। তোমাকে না সবাই ভালো ছেলে বলে। সেই থেকে সমস্ত মনটা এমন খারাপ হয়ে আছে যে বলার নয়। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর, দুখ্যু হচ্ছে মায়ের জন্য। মা জানতে পারলে কী ভাববে। অরুণদা, তারপর থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি যেন ভয়ানক পাপ কাজ করলাম। যা করতে নেই তা করলে মনের খচখচানি শেষ হতে চায় না। আমি কেবলই ভাবছি যে যারাই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে তারাই সব বুঝতে পারছে। পাপে আমার ভয় নেই, সাজাকেই ভয় করে। ভগবান কী সাজা দেবে কে জানে।

তারপর তোমার সঙ্গে আর একটিও কথা বলিনি আমি। আজ সকালবেলা চুড়িউলি ডেকে একগোছা কাঁচের চুড়ি পরেছি। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলাম। মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। তুমি চলে গেলে তারপরে মাথা তুললাম আমি। তখন সেখানে বসে বসে আমার

ভীষণ কান্না পেল। মনে হল আমার মায়ের অসুখ বলেই তোমার এতটা সাহস হল। তা না হলে তুমি পারতে না একাজ করতে। তোমার নিজেরও নিশ্চয় ভয় করেছে খুব। কেননা তোমার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক্যাবলাকান্ত হয়ে গেল সে আমি এক সেকেণ্ডেই দেখে নিয়েছি। হঠাৎ করে ফেলেছ বুঝলাম। কিন্তু আর কখনো কোরো না যেন।

আজ সারাদিন কোন কাজ হয়নি। এমনিতেই সাত-শ ঝঞ্ঝাটে পড়াশুনা কিছু হচ্ছে না একদম, তার ওপর যদি এরকম হয় তাহলে দাঁড়াই কোথা। জানো অরুণদা, আজ আমি একটা ভাত খেতে পারিনি। চান করিনি, চুল বাঁধিনি। সারাটা দুপুর ঘরের দরজা বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিলাম। 'ভীষণ ষড়যন্ত্র' বলে একটা বই ছিল আমার কাছে। পড়তে একদম ভালো লাগল না। সেই এক কথা, সেই এক ব্যাপার। ইলু এলে, তখন ভাবলাম, ইলুকে সব বলব। কাউকে একজনকে না বললে মনে শান্তি হবে না। ও যখন এল তখন আবার মনে হল, না থাক বলে কাজ নেই। যদি ও মনে মনে তোমাকে খারাপ ভাবে তাহলে আমার বড় খারাপ লাগবে। আর সেই জন্যেই এ চিঠি আমার লেখাই সার। তোমায় এ চিঠি পাঠানো যাবে না।"

সন্ধ্যেবেলা ভোর আলো জ্বালিনি ঘরে। একা একা চুপ করে বসেছিলাম। আকাশ পাতাল ভেবে কিছু কিনারা করতে পারছিলাম না। ওপরের চিঠিটাও আর সাত-পাঁচ ভেবে শেষ করলাম না। এই প্রথম একটা ব্যাপার হল আমার জীবনে যা মাকে বলা চলবে না। এই প্রথম একটা ব্যাপার ঘটল যেখানে মা আর আমি একদিকে দাঁড়িয়ে নেই। এই প্রথম আমি কিছু লুকোতে যাচ্ছি। বড়রা তো কত কী লুকোয়। বাবা তো টুলুমাসির কথা সবই লুকিয়ে রাখে মায়ের কাছে। কিন্তু না, বাবার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার এক নয়। আমরা দুজনেই মায়ের কাছে সমান অপরাধী নই। আমার দোষ কম। প্রথম, আমি ছোট মেয়ে, আমার বুদ্ধি কতটুকু। দ্বিতীয়, দ্বিতীয় আর কিছু মাথায় আসছে না।

যাকগে যা হয়েছে এ নিয়ে বেশি মাথাখারাপ করব না। তখন উঠে আস্তে আস্তে আলো জ্বাললাম। পড়া আজ আর হবে না বুঝতেই পারলাম। একটা ছোট আয়না হাতে করে আবার বিছানাতেই ফিরে এলাম। চুল বাঁধিনি, চান

করিনি মুখটা কেমন লালচে লালচে হয়ে রয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি আমার মুখখানাই দেখছিলাম। নাক চোখ গাল। একটু একটু লাল ঠোঁট। আমি আমাকে এমন করে কোনদিন দেখিনি। সাদাসাদা দাঁতগুলো ঠোঁট বেঁকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার আর সব মুখ মনে থাকে, কেবল নিজের মুখখানা স্পষ্ট করে মনে থাকে না। আশা মিটিয়ে দেখছিলাম। দেখতে দেখতে মনে হল আমি যদি অরুণদা হতাম। আমি মনে মনে অরুণদা সেজে আরসির মঞ্জুকে হঠাৎ একটা চুমু খেলাম। তারপর তাড়াতাড়ি আরসিখানা রেখে দিলাম। আমি ভয়ানক অসভ্য হয়ে যাচ্ছি।

১০ই জুন—

টুলুমাসি এসেছিল আজ বিকেলে। মায়ের ঘরে বসেছিল খানিকক্ষণ। মা কেমন ঠাণ্ডা মাথায় টুলুমাসির সঙ্গে কথা কয় দেখলে অবাক হতে হয়। টুলুমাসির শান্তিপুরের ভদ্রতার সঙ্গে মাও বেশ লৌকিকতা করছিল আমি আমার ঘরে বসে বসে শুনছিলাম। টুলুমাসি মাকে বলছিল—আপনি দিদি কলকাতা যান, কলকাতায় কোন বড় ডাক্তারকে দেখান গিয়ে, এখানকার মফস্বলের ডাক্তাররা আদ্ধেক রোগের নামই জানে না। আমি মনে মনে বললাম, তাহলে তোমার ভারি সুবিধে হয়, নেকী। ফাঁকা মাঠে নেত্য করে বেড়াও একেবারে। মা বলছিলেন—কলকাতার ডাক্তারও তো কল দিয়ে এখানে আনানো হল ; তাদের চিকিৎসাও তো কম হল না, কই, বরাতে করে সব ভাই, তা না হলে কিছু না। টুলুমাসি অমনি সুয়ো সেজে বলল—তা বটে, বরাতটাই সব। আমি বললাম মনে মনে, অবিশ্যি বরাত জোর না থাকলে তুমি এই রূপসাডিহির জংলা জায়গায় রাজ্যিপাট চালিয়ে যাও কেমন করে। টুলুমাসিকে মা আবার পুডিং খাওয়ালো। আমি হলে অমন মেয়েকে বিষ গুলে দিতাম খানিকটা। আচ্ছা টুলুমাসি কী করতে মায়ের কাছে আসে বলতে পারে কেউ? এসে তো ঘামে বসে বসে আর মাথা নেই মুণ্ডু নেই বোকার মত বকে। বলছিল কি—আপনার মঞ্জু দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে গেল এইবার। তাতে তোর কী! মাও তেমনি বেশ আস্তে করে ঝাল মিষ্টি জবাব দিল, বলল—সবাই আর সে কথা মনে রাখে কই বলো। টুলুমাসি চুপ। দু-মিনিট ঘড়ির টকটক ছাড়া

আর কিছু শোনা গেল না। বোকার মত কথা বললে এমন রাগ ধরে আমার—টুলুমাসি বলছে, সিতাংশুদার বোধহয় আসতে রাত্তির হবে, নাকি? মা বলল—না, আজ সকাল সকালই ফিরবে এখন, বোস ততক্ষণ। টুলুমাসি খোঁচাটা বুঝল কি বুঝল না, ভগবান জানেন তবে বসেই রইল। আমি হলে আর বসতাম না উঠে যেতাম, ওই এক ধরনের ঘ্যাঁচোড়। শুনতে পেলাম টুলুমাসি সোহাগ জানাচ্ছে মাকে—সিতাংশুদার খুব মনখারাপ আপনার অসুখের জন্যে। মা জিগ্যেস করলে—তোমায় বলছিল বুঝি? উঠে আয় না ওখান থেকে—আমার বলতে ইচ্ছে করছিল। আ গেল। রমেশ কাকিমার তবু একটা হায়া আছে। আসে না বড় একটা। আহা কোন্ মুখেই বা আসবে বল না। যতই হোক নিজেরই বোন তো। অমন বেহায়াপনা করে বেড়াচ্ছে লজ্জা করে না। আমি হলে তো দেশ গাঁয়ে মুখ দেখাতাম না আর। এমন সময় সুখদা টুলুমাসিকে চা দিতে এসে খবর দিল যে ইলু এসেছে। ইলু এসেছে? মা আর টুলুমাসি রইল ছুঁই কি না ছুঁই সিঁড়ি পা যেন পিয়ানোর রিডে আঙুল গেল। গিয়ে দেখি ওমা ইলু সাপ-লুডো এনেছে, ও খুব সাপ-লুডো খেলতে ভালবাসে। আমার কিলবিলে সাপের ছবিগুলো দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।

ইলু জিগ্যেস করল—মাসিমা একা আছেন?

বললাম—না।

—কে আছেন!

—মিসেস ফল্‌স।

ইলু বলল, বেশ নাম রেখেছিস—ওর সবই ফল্‌স—হাসিটাও। ইলু লুডো পাতল। ছায়া ছাঁকা রোদ একটু একটু ঘরের মেঝেয় পড়ছে, আমরা তাকে পাশে রেখে সোফা-সেটি সরিয়ে মেঝের ওপর ফ্রক তুলে বসে পড়লাম। আমি লাল ঘুঁটি, ইলু সবুজ। সব থেকে মস্ত বড় সাপটার নাম আমি রাখলাম টুলুমাসি। ইলু বলল—তোর টুলুমাসির ওপর বড় রাগ না রে? দান চালতে গিয়ে থেমে গেলাম, বললাম—তোর হলে হত না রাগ? ওর পোয়া পড়ল ঘুঁটি বেরুল। ইলু জিজ্ঞাসা করল—মঞ্জু?

—কী।

ইলু বলল—তোর খুব কষ্ট না রে?

আমার হাত কেঁপে গেল, মাটিতে একটা পোয়া পড়ল, মাথা নিচু রেখে বললাম—কষ্ট আবার কী। ইলু বলল—তোর সব থেকে বড় বন্ধু কে? বললাম—তুই আবার কে?

ও কী বলবে কে জানে আমি ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

ও বলল—তুই সব কথা তো বলিসনে আমায়।

আমি পাঁচ ঘর ঘুঁটি এগিয়ে গেলাম। বললাম—কী বলবো বল্? ইলু কী বলবে? তিন চার ছয় আট—আট কুচো রোদ—দশ কুচো ছিল এতক্ষণ। আমার ভীষণ ভয় করছিল তাই রোদ গুনছিলাম।

ইলু দান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল—বলব? টুলুমাসির কথা?

পাকা গিন্নীর মত শোনাল আমার জবাব—জানিস তো। বলবার কিছু আছে আর? ইলুর গলা একটু যেন কেঁপে গেল। ও বলল—আরও তো অনেক কিছু বলিসনি।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার কী কথা?

ও বলল—অরুণদার কথা। আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। জোরে নিশ্বাস নিলাম। মনে হল আমার ভেতরের জামার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যাবে ফট্ করে। লুডো ফেলে রেখে বললাম, কী বলছিস তুই? ইলু বলল—অরুণদা বলছিল আমার দাদাকে, ওকে তুই জন্মদিনের দিন কী বলেছিলি?—আমি মনে মনে ভাবলাম অরুণদাটা আচ্ছা বোকা তো, সেদিনের কথাও বলে দিয়েছে নাকি। এ রাম! ইলু বলছিল—তোকে নাকি সেদিন খুব ভালো দেখাচ্ছিল। ও বলেছে তোকে ও ভীষণ—। আমি লুডোর ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ইলুকে জড়িয়ে ধরলাম। ইলুর মুখ চেপে ধরে বললাম—ইলু লক্ষ্মীটি, চুপ কর কিছু বলিসনে। একটু পরে ইলু বলল—ছেড়ে দে টিপ ঘষে যাবে যে।

তারপর আবার আমরা লুডো পেতে বসলাম। খেলা শুরু হল। লাল ঘুঁটি এগিয়ে গেল, সবুজ ঘুঁটি টপকে গেল আমাকে দু-বার, আমি আবার ধরলাম। ইলু দুটো ছক্কা পেল, কে আগে একশোর ঘরে উঠবে, কে? ইলু আর আমি হেসে চেঁচিয়ে ঘর ফাটিয়ে ফেলছিলাম। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম অনেক—অনেক—অনেক। একশো ধরি ধরি আর কি। ইলু ঢং করে কাঁদতে বসল পা ছড়িয়ে, ওমা আমি হেরে যাবো। এমন সময় সাতানব্বইয়ের ঘরে গিয়ে টুলুমাসি—

থুড়ি সেই মস্ত বড় সাপটা আমার লাল ঘুঁটি খেয়ে ফেললো। আমরা দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমি বললাম, টুলুমাসি আমায় খেয়ে ফেলেছে। আর ঠিক সেই সময় আমরা দুজনেই যখন চেঁচামেচি করতে করতে খিলখিল হাসিতে বিভোর তখন হঠাৎ ইলু বলে উঠল -এই চপ কর, এই—আমি পিছু ফিরে দেখি দরজার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুলুমাসি। টুলুমাসির টুকটুকে ঠোঁট, টিকটিকে নাক. টসটসে গাল চুন সাদা হয়ে গেছে তখন। দেঁতো হাসি হেসে টুলুমাসি বলছিল—আমি কাকে খেয়ে ফেললাম মঞ্জু? আমার মন বলছে তখন, মা ধরিত্রী দ্বিধা হও!

১০ই জুন—

ঠিক যে রকমটা পড়েছিলাম সেই বইটায় সেই রকম দেখছিলাম—এক প্লেট সুপুরি লবঙ্গ এলাচের সামনে হাতিটা শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এপাশে দিব্যি একটা বাছুর গা ঘেঁষে আদর কাড়াচ্ছে মস্ত বড় সাদা গোরুটার কাছে। ওদের একটুও ভয় করছে না—অথচ ওদিকে একটা হাঁ-করা বাঘ লাল জিভ বার করে তাকিয়ে রয়েছে কটমট করে। অবশ্য বাঘের পেছনেই একটা বেবুন দাঁত খিঁচোচ্ছে। তা সে হাতিটাকে না বাঘটাকে না গোরু দুটোকে বোঝা যাচ্ছে না। হুঁকো খেতে খেতে বুড়ো সেই যে ঘাড় দোলাচ্ছে আর থামতেই চাচ্ছে না। যদি বাঘে ঘাড়টা মটকে দেয় তখন মজা টের পাবে বুড়ো। মাঝখানে পড়ে রয়েছে একটা মস্ত বড় আতা। সেদিকে কারুর নজর নেই। এমন কি যে চাষীটা লাঙল ঠেলছে জমিতে তারও না।

এখন দুপুরবেলা। ফ্যান চলেছে শোঁ শোঁ করে। কিছু না পেতে সুখদাকে দিয়ে ঘর মুছিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় পড়ে আছি উপুড় হয়ে। ঠাণ্ডা মেঝেয় খাতাটা রেখে দেখছি আর লিখছি। দেখতে দেখতে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর কখনও হবে না ওসব। বেশ ছিলাম তখন। আমার এইটুকু মাথায় তখন এত ভাবনা ছিল না। মা ছিল আস্তো অটুট মা, বাবা পর্যন্ত মাকে ভয় করত।

এখন অন্যরকম। অরুণদা ছাড়া আর কোনটাই আমার মনের মতন নয়। ঐ যে ছেলেটা ওর মত আমার অবস্থা। ছেলেটার গায়ে কিছু নেই।

একটা মস্ত বড় সাপ জড়িয়ে ধরেছে ছেলেটাকে। আর ছেলেটা দুটো হাত দিয়ে সাপের ফণাটাকে চেপে ধরেছে। গলা টিপে মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু পারছে না। এটা যদি আলমারির পুতুলটা না হয়ে আমি হতাম—এতক্ষণ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম সাপটাকে— বড় সাপটাকে।
টুলুমাসি যদি বলে দেয় বাবাকে?

১২ই জুন—

ভালো লাগে না। একদম ভালো লাগে না এই অশ্রুনিলয়ে। ঝিরঝির করে সারাদিন পাম গাছের পাতা, সিরসির করে দেবদারু, জামরুলের দিন গেল গেল, কত শুকনো পাতা মরমর করে বাগানের রাস্তায়, শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকে সূর্যমুখী ফুলের ঝাঁক আকাশের দিকে আর হু হু করে আমার মন। মানুষ কেন তাড়াতাড়ি বড় হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একা একা ঘুরি ঘরে ঘরে আর বাগানের গাছতলায়। মায়ের চুল আঁচড়ে দিই, বাবাকে চা দিই, ইলু আসে গল্প করি, অরুণদা আসে গল্প শুনি কিন্তু একা লাগে বড়। মনে হয় চেপে ধরেছে আমার গলা এই বড় বাড়িটা আর বাগানটা। মা আর বাবা নিজেদের মধ্যে কথা কয় না বললেই হয়। আমাকে মাঝে রেখে কথা কয়। সেদিন আর এক ফ্যাসাদ। ইলুর চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছিল বাগানে, বামবিরিজ খাম দেখে বাবার চিঠি মনে করে রেখে এসেছিল বাবার টেবিলে। বাবা ইলুর চিঠিখানা নিশ্চয় পড়েছে কেননা তারপর বাবার প্যান্টের বোতাম পরাতে গিয়েছিলাম, বাবা তো কই আমার দিকে তাকালো না। আমি চিঠিখানা ওখান থেকে সরিয়ে সুখদাকে দিলাম, আমার ঘরে রেখে আসতে বললাম। বাবা বুঝতে পেরেছে দেখে আমারও কেমন লজ্জা করছিল। আজ বাবার ঘরে সকালে গিয়ে হঠাৎ মনে হল বাবাকে একটা কথা বলি। বলি কি না বলি, বলি কি না বলি করতে করতে শেষে বলে ফেললাম— বাবা তুমি একটু সকাল সকাল ফিরতে পারো না। বাবা চমকে গেলেন যেন সাপ দেখেছেন। আমি বলে চললাম, আমি একা থাকি একদম ভালো লাগে না, আজ ফিরবে বাবা সকাল সকাল?
বাবা আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা ফিরবো আজ।

আমি বললাম—ফিরো কিন্তু ঠিক। আমি মাংসের পরোটা করতে শিখেছি, করে রাখব তোমার জন্তে, হ্যাঁ ?

বাবা বললেন, বেশ।

—কিন্তু কোথায় বসে গল্প করা হবে বাবা

—কেন মায়ের ঘরে বসে। বাবা হেসে ফেললেন—কেমন ? তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, মঞ্জু মা তুমি বেশ বড় হয়ে গেছ না ?

আমার খুব লজ্জা করছিল, জিজ্ঞাসা করলাম কেন বাবা ?

—তুমি আজকাল সব বুঝতে শিখেছ।

আমি কি বলব চুপ করে রইলাম।

তারপর বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন—তোর আমার ওপর খুব রাগ হয়, না রে মঞ্জু ?

আমি ঘামছিলাম ভেতরে ভেতরে, বললাম, আমি এখন যাই বাবা।

—না, বোস্, বাবা বললেন—তোরা আমাকে ঠিক বুঝতে পারিস না।

—তুমি ঠিক করে বোঝাও না কেন ? আমি বললাম।

বাবা টাইটা গলায় উড়নির মত করে জড়িয়ে রেখেছিলেন ঠিক করে বাঁধতে বাঁধতে বললেন—মায়ের ঘরে যাস ? বসে থাকিস খানিকটা করে ?

বললাম, যাই।

কি করে সারাদিন তোর মা ?

—চুপ করে বসে থাকে আর কখনও কখনও কাঁদে।

বাবা ঘরের বড় আয়নাটার ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম তক্ষুনি। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেন। আবার মনে করিয়ে দিলাম—বাবা ঠিক আসছ সকাল সকাল ?

বাবা বললেন—ঠিক।

মন্দ কাটলো না সারাদিন। ময়দা, মাংসের কিমা, উন্থন, আগুনের তাত, ঝাঁ ঝাঁ রোদ, স্থখদার সঙ্গে চেঁচামেচি—রামবিরিজকে দু-বার বাজার ছোটানো। দিন কেটে গেল দেখতে দেখতে। মা দু-বার খোঁজ করলেন। মাকে বেশ হাসিখুশি লাগছিল। তাই মাকে বলেছিলাম প্ল্যানটা। মা শুনে হেসে ফেলেছিলেন। বললেন বাবা'কে শেষটা নেমন্তন্ন [illegible]। মাটা
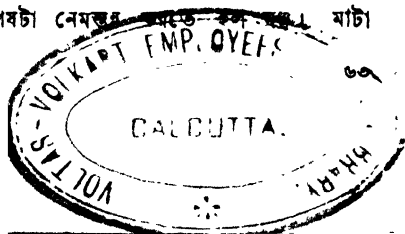
যেন কি, ঐ কথা বলে আমায়।

সারাদিন আগুন তাতের পর গা ধুয়ে আর শাড়ি জড়াতে ভালো লাগলো না। তাছাড়া জানি বাবা এখনো ফ্রক পরাটাই পছন্দ করেন। জন্মদিনে মায়ের দেওয়া ব্রোকেডের ফ্রকটা পরেছিলাম আমি। একটা বিনুনি পড়েছিল আমার বুকের ওপর আর একটা পিঠে। টিপ পরলাম না বাবা ভালবাসেন না বলে। বাবার দেওয়া নেকলেসটা পরলাম বাবার জন্যে, হাতে মকরমুখো প্লেনবালা পরলাম মায়ের জন্যে। বাবা একটুখানি লিপস্টিক ঘষা ভালবাসেন সেজন্যে কিনেও দিয়েছেন, মা দেখতে পারেন না। বলেন, মঞ্জুর রঙ এমনিই খুব ফর্সা তার ওপর ঠোঁটও লাল, রঙ মাখতে হবে না। দু-দিক সামলাবার জন্য দুপুর ঘেঁষে একটা পান খেয়ে নিয়েছিলাম, গা ধোয়ার সময় মুখ ধোয়ার ইচ্ছে থাকলেও মুখ ধুলাম না।

তারপর যখন পাঁচটা বাজে বাজে, রোদ যখন ঢিমে হয়ে এসেছে খানিকটা তখন মাকে সাজাতে বসলাম। সুখদা মাকে একটা ঢাকাই পরাল, আমি চুল আঁচড়ে এলো খোঁপা বেঁধে দিলাম, সিঁদুর টিপ পরালাম কপালে। মুখখানা ঘষে দিলাম তোয়ালে দিয়ে, ওটিন দিয়ে রগড়ে দিলাম। মা আদর করে বকছিল আর হাসছিল, রোগা রোগা মুখের হাসি আমার মার মুখে ছাড়া মানায় না, মা আমার সুন্দর দুর্গাপ্রতিমার মত দেখতে। লোকে দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখত মাকে, বাজার দোকানে বেরুলে। নাক আমার চেয়েও টিকোল- আমার নাকটা মায়ের মত হয়নি, একটু মাংস বেশি নাকে—মা বলে, আমি নাকি সেইজন্য অত চাপা আর জেদী। তবে এক জায়গায় আমার মায়ের চেয়ে জিত আছে। আমার কপালটা ছোট্ট আর চিবুকের এপাশে একটা তিল আছে।

মায়ের খাটের কাছ থেকে ওষুধ আর মালিশ বোঝাই গোল টেবিলটা খালি করে সুখদাকে বললাম—ওষুধগুলো আমার ঘরে নিয়ে যা। নতুন পাতা নেটের ওপর ছুঁচের কাজ করা টেবিল ক্লথের ওপর একটা মোরাদাবাদী ফুলদানির মধ্যে বসিয়ে দিলাম এক গোছা রজনীগন্ধা।

ঠিক পাঁচটার সময় বাবা ফিরলেন। বাবার জন্যে একটা তাঁতের ধুতি আর পাটভাঙা পাঞ্জাবীতে বোতাম পরিয়ে রেখেছিলাম। স্নান করে ধুতি পাঞ্জাবী পরে বাবা বেশ ঘটা করেই এলেন ঘরে। আমি বাবার রুমালে একটু ক্যালিফোর্ণিয়ান

পপি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। ফ্যান শোঁ শোঁ করছিল—ঘরখানা রজনীগন্ধার গন্ধে ম ম করছে। মায়ের শুকনো চুল উড়ছিল, এলানো খোঁপা এলিয়ে ভেঙে গেল মায়ের সাদা ঘাড়ের ওপর। বিকেলের পড়ন্ত লাল রোদ ঝিকিমিকি করল দহিজুড়ির সেই গ্রুপ ফটোর ওপর। বাবা মায়ের খাটের কাছে চেয়ারটা টেনে এগিয়ে এলেন, ডাকলেন- অশ্রু। মা একটু হাসলো। মাকে কেমন লাজুক লাজুক দেখাচ্ছিল। বাবা মায়ের চুলগুলো কানের পাশে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন—দেখ এসেছি ঠিক।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়ের নেমন্তন্ন এড়ানো গেল না ?

বাবা বললেন—মেয়ের মাকে যদি না এড়ানো যায় মেয়েকে এড়াই কী করে ?

মা বললেন - তবু ভালো যে মেয়ের ভেতর দিয়েও টিকে থাকব অন্তত।

তারপর মা আর বাবা আমার দুটো হাত ধরে তাদের মাঝখানে টেনে নিলেন আমায়। মা বললেন—আজ মঞ্জুর সারাদিন ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি, তোমাকে জামাই আদর না করে ও ছাড়বে না।

বাবা বললেন—আমি তো জামাই বটে, তুমি তো ওর মেয়ে না মঞ্জু ?

ছোটবেলা থেকেই বাবা মা এই ঠাট্টাটা আমার সঙ্গে করেন। আমি বরাবরই জবাব দিই— না তুমি আমার ছেলে, মা ছেলের বউ। এবারও সেই জবাবই দিলাম। মা-বাবা যেমন একসঙ্গে হেসে উঠতেন তেমনি হেসে উঠলেন আমার কাঁধে হাত রেখে। আর হঠাৎ হু হু করে আমার চোখ ছাপিয়ে জল এল, আমার ঠোঁট ফুলে উঠল, আমি কেঁদে ফেললাম। মা-বাবা দুজনেই আমার চোখের জল মোছাতে লাগলেন। মা কাঁপা-কাঁপা হাতে, বাবা শক্ত হাতে। দুজনেই বললেন—ছি মঞ্জু কাঁদে না।

কান্নার পর মনে হল বিকেলটা কী সুন্দর, মনে হল আজ আমি জিতেছি—টুলুমাসি হেরে গেছে। আমিই টুলুমাসিকে খেয়ে ফেলেছি আজ। বাবার জন্যে পরোটা আনতে নিচেয় গেলাম। বাবার ঘর দিয়ে ফেরত আসতে আসতে দেখি বাবার খাটের ওপর একটা শাড়ির মোড়ক। লোভ হল। প্লেট নামিয়ে রেখে মোড়কটা খুললাম। দেখি লাল রঙের সুন্দর একটা মাইশোর সিল্ক। পাড় সোনালী জরিদার, আঁচলায় খয়েরীর ওপর সোনার আঁজি দেওয়া। বুঝলাম

বাবা আমাকে অবাক করে দেবে বলে এনেছে। কেননা লাল রঙ তো মা পরে না, আমি বড় হবার পর থেকে মা সাদা আর ঘিয়ে রঙ ছাড়া কিছু পরে না। খুব পছন্দ হল শাড়িটা, আমার ফর্সা রঙের সঙ্গে যা মানাবে। আমার একটা ব্রোকেডের ব্লাউজ আছে, বেশ ম্যাচ করবে এখন। এক জোড়া লাল রঙের চুনি বসানো দুল আছে, সেটা পরব কানে; পায়ে দোব লাল স্ট্র্যাপ দেওয়া সোয়েডের স্যাণ্ডেল, কপালে লাল কুঙ্কুমের টিপ, লাল নেলপালিশ দোব নখে,—যা দেখাবে আমার—এক্সেলেন্ট।

আমি যে শাড়িটা দেখেছি বাবাকে বললাম না। ভাবলাম বাবা যখন দেবে এমন অবাক হয়ে যাব যে দেখে বাবাও অবাক হয়ে যাবে।

সারা সন্ধ্যে আজ বাবা রইল মার কাছে। কত কথা হল দুজনে। নতুন একটা মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টের কথা আছে, মিঃ ওয়াদিয়া বেগরবাঁই করছে, শোনা যাচ্ছে পিল্লাইকে দেবে নাকি। বাবা বলল, পিল্লাই খুব 'চিকনের কাজ করছে' (মানে ঘুষ দিয়ে বা আর কিছু দিয়ে খুশি করছে) মিঃ ওয়াদিয়াকে একটু এন্টারটেন করা দরকার। সংসারের কথা হল, আমার সঙ্গে পড়াশুনার কথা হল। কথা হল অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর আমায় কলকাতায় পড়তে পাঠানো হবে। আমার বেশ খুশি লাগল শুনে—অরুণদাও কলকাতায় আমিও কলকাতায় বেশ হবে। মা কলকাতা যাবে না চিকিৎসা করাতে সেকথা মা জানিয়ে দিল। বাবাও বেশ চালাকি করে বলল—কেন যাবে না, আমিও তোমার সঙ্গে যাব তো। মা বলল, সে আলাদা কথা। যখন মায়ের কলকাতা যাওয়ার কথা হচ্ছিল—ওয়াদিয়ার কথা হচ্ছিল আমি মনে মনে তখন ভগবান ভগবান করছিলাম, এই বুঝি বেমক্কা কেউ কিছু বলে বসে। কিন্তু না ঠিক ঠিক কেটে গেল সন্ধ্যেটা। কথা হল পরের বুধবার বাবা আমাকে নিয়ে দড়িজুড়ির জঙ্গলে বেড়াতে যাবে। ইলু কৌশল্যাকেও বাবা বলতে বলল, মা বলল অরুণকেও বলিস। তোর বাবার সঙ্গে সবাই মিলে যাবি বেশ।

খুব ভালো খুব ভালো। আজকের সন্ধ্যের মতন সন্ধ্যে গত এক বছরে অশ্রুনিলয়ে আসেনি। ঠিক কথা বলে রামবিরিজ—বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাওয়া সুর দুর্লভ সব গ্রন্থ হি গাওয়া।

ঠিক কথা বড় ভাগ্যে মানুষ হয়ে জন্মানো যায়। কিন্তু শাড়ির কথাটা কী বাবা

ভুলে গেল? কই দিল না তো।

মনে করিয়ে দেব কাল সকালে? যাঃ তাই আবার দেয় নাকি।

১৪ই জুন বুধবার—

দহিজুড়ির জঙ্গল। এইমাত্র ফিরলাম দহিজুড়ির জঙ্গল থেকে। আমি একা ফিরলাম। তিন মাইল জংলা রাস্তা অন্ধকারে একা একা হেঁটে হেঁটে ফিরলাম। নিজের বুকের ধুকধুক শুনতে শুনতে, চোখের জলে আকাশের তারা ঝাপসা দেখতে দেখতে, ভয়ে কেঁপে, রাগে ফুলে কখনো ছুটতে ছুটতে কখনও থামতে থামতে এইমাত্র নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। আজ দহিজুড়ির জঙ্গলে আমার এই তিন দিনের দেখা স্বপ্ন ছাই হয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজে বসে রইলাম—কেন মরতে গিয়েছিলাম দহিজুড়ির জঙ্গলে। মা ডাকছে ওপর থেকে। ডাকুক, ডাকুক, সারা দুনিয়া ডাকুক। খুলব না এখন দরজা। মাকেও বলি মা মামণি, তুমি হয় ঠিক করে বাঁচো নয় ঠিক করে মরো, তোমার এই বেঁচে মরে থাকা আর সহ্য হয় না। এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে বাবা দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টুলুমাসিকে চুমু খাচ্ছে। আর টুলুমাসি বাবার বুকে মুখ রেখে ফোঁপাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অরুণদা আসেনি। কেন আসেনি ভগবান জানে। জিপে যখন শুনলাম ও আসবে না তখন একটু মন খারাপ হয়েছিল—এখন দেখছি না এসেছে ভালোই হয়েছে। ইলু, কৌশল্যা, পলাশ, বিলু আর আমি একটা জিপে রামবিরিঞ্জকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দহিজুড়ি। কথা ছিল বাবা তার আপিসের জিপে করে আমাদের কাছে চলে যাবেন আপিস থেকে সটান। আমরা তাই খাবারের বাস্কেট, চায়ের ফ্লাস্ক, সতরঞ্চি এটা ওটা নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ো-বুড়ি পাহাড়ের তলায় শালগাছের মেলা। বড় বড় পাথর কালো কালো ঘুমন্ত ভালুকের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। ইলুরা সব লুকোচুরি খেলবে বলে গুণতে শুরু করল—উ দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ……। বেশ ছায়া-ছায়া ঘোর বিকেল। ওরা খেলুক, আমি ভাবলাম একটু ঘুরে বেড়াই। অশ্রুনিলয়ের থমথমে হাওয়া এখানে এসে ফুরফুর করছে। এত পাখি, এত গাছ, এত গান -

মনে হল খুঁজে দেখি এইখানেই কোথায় আছে সেই গাছটা যেখানে আমাদের নাম লেখা আছে—মায়ের, বাবার আর আমার। আরো দু-বার এসেছি, নামগুলো দেখে গেছি আরো দু-বার। আমি সেই পাথরটা খুঁজছিলাম যেখানে আমরা গ্রুপ ফটো তুলেছিলাম অনেক দিন আগে। বুড়োবুড়ি পাহাড়ের কোলের কাছে ছানাপোনা পাথরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল অরুণদা এলে বেশ হত। এইখানে একটা পাথরের ওপর বসে বসে পা ছড়িয়ে দিয়ে অরুণদা কবিতা বলত আর আমি শুনতাম। বোকারাম একদম বুঝতে পারে না যে আমি সব বুঝতে পারি—খানিক বাদে বকে বকে দম ফুরিয়ে গেলে অরুণদা বলত—তুমি কিচ্ছু বোঝ না মঞ্জু।

সূর্যদেব ঝিকিমিকি খেলছে আকাশে। তাল গাছে পাখিদের চড়ক মেলার ভিড়— কোন্ পাথরটা? কোথায় কোন্ পাথরটায় বাবা মায়ের আর আমার নাম লেখা আছে? ভাবছিলাম আর ঘুরছিলাম, ঘুরছিলাম আর আবোল-তাবোল ভাবছিলাম। এইটা—এইটা, No, এইটা—উভি নেহি, তব? প্রত্যেকবারই আমি ঘুলিয়ে ফেলি, প্রত্যেকবারই

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কে কথা বলছে? কারা যেন বসে আছে ওদিকে পাথরের আড়ালে?

—কী ব্যাপার মস্ত বিনুনি আজ যে সাপের মত দুলছে?

—শুধু বিনুনিই নয় মশাই, আমিও সাপেরই মত।

—তাই নাকি, কে বলেছে?

—তোমারই কন্যা, সাপ-পুড়ো খেলছিল, বলছিল বড় সাপটা টুলুমাসি।

—তাহলে আমি সাপ খেলাচ্ছি বল, টুলু।

—সে কী করে বলি বলো, অনেক সময় সাপেও সাপুড়েকে খেলায়, জানো সে কথা?

—সাপুড়ে মনে করে সেই খেলায়।

—সারা জীবন বুঝতেই পারলাম না কোথায় খেলছি, কোথায় খেলাচ্ছি—এই তো তোমার জিপে চড়েই চলে যেতে হবে ওয়াদিয়ার কাছে, ওখানে তো খেলতেই যাবো সিতাংশুদা।

—প্লিজ টুলু। ওয়াদিয়া যেন না বিগড়োয়। তাহলে সব গেল, পিল্লাইয়ের

কাছে ড্যাম ডিফিট হয়ে যাবে তাহলে।

এই অবধি শুনেই আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। ওরা চুপ করে গেল কেন, চুপ করেছে কেন? পাথরের আড়াল থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। কেন দেখলাম? কী হত যদি নাই দেখতাম যে বাবা টুলুমাসিকে জড়িয়ে ধরেছে। টুলুমাসি মাথাটা বাবার বুকে ঘষটাচ্ছে আর বলছে—'সারা জীবন সবাই আমাকে নিয়ে শুধু তামাসাই করে গেল, সিতাংশুদা।' আর বাবা? আমি কেন অন্ধ হয়ে গেলাম না? বাবা তখন টুলুমাসির মুখে চুমুর পর চুমু খাচ্ছে আর বলছে—'বিশ্বাস কর টুলু, আমি হয়তো ব্যবহার করেছি তোমাকে, কিন্তু তামাসা করিনি, কক্ষনো না।' সেই টকটকে লাল মাইশোর সিল্কের আঁচল তখন টুলুমাসির বুক থেকে খসে গেছে। টুলুমাসি বড় বড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলছে—'ঠিক বলছ? ঠিক বলছ, সিতাংশুদা?'

মাইশোর সিল্কটা তাহলে টুলুমাসির জন্যেই এসেছিল? আর আমি ভাবছিলাম-- ছিঃ। আমার মাথা টলছিল, কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। নাকি দহিজুড়ির জঙ্গলের সমস্ত ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল আমার দু-পাশে কে জানে? যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম, নখ দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলতে পারতাম টুলুমাসিকে—আমি তখন বাড়ির রাস্তা ধরেছি। গাল দুটো গরম হয়ে গেছে, দহিজুড়ির সমস্ত গাছ যদি একসঙ্গে বাতাস করে তাহলেও জুড়োবে না শরীর। কোথায় যাব —ভাবলাম কোথায় যাব—মার কাছে? সেই জংলা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলাম। জঙ্গল পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে জঙ্গল। পা ছিঁড়ে যাবে? বুক ফেটে যাবে, যাবে যাক—আমি মায়ের কাছে যাবো। নিঝুম অন্ধকারে বেঘোরে চলছিলাম—ভয় করছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মা মা আমার। আকাশের তারা আমার সঙ্গে ছুটছিল। ছুট-ছুট-ছুট। ওরা থাক পড়ে দহিজুড়িতে। বাবার মুখ দেখব না, কখনো আর দেখব না। গেট খুলে বাগান পেরিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে দিলাম।

মা ডাকল—মঞ্জু, কী হয়েছে বলো—না। সুখদা ডাকল—মঞ্জু, না। নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে বসে রইলাম। আজ রাতে কারুর সঙ্গে দেখা করব না। না, কিছুতেই না।

ঐ শুনতে পাচ্ছি এতক্ষণে বাবা বোধহয় ফিরল—গেটে মোটরের শব্দ

পাচ্ছি। ইলু বিলুও এসেছে। ওরা নিশ্চয় আমাকে খুব খুঁজেছে। বাবাও হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এল। মাকে কি জিজ্ঞাসা করল বাবা। আমার বন্ধ দরজায় ঘা দিচ্ছে। বলছে—মঞ্জু, দরজা খোল, মঞ্জু—

না। মঞ্জু দরজা খুলবে না। মনে ছিল না টুলুমাসিকে চুমু খাওয়ার সময় যে মঞ্জু বেঁচে আছে, মনে ছিল না টুলুমাসিকে মাইশোর সিল্কটা দেবার সময়। বাবা এখনও দরজায় ঘা দিচ্ছে, দিচ্ছে দিক খুলব না দরজা।

১৫ই জুন, সকাল—

ঘুম? ঘুম কোথায়? শুধু স্বপ্ন দেখেছি সারা রাত। স্বপ্ন দেখেছি সারারাত যেন দহিজুড়ির জঙ্গলে আমি আর অরুণদা বেড়াতে গেছি। একা একা। সেই বুড়োবুড়ি পাহাড়ের টিলার পিছনে শালগাছের তলায় অরুণদা আমাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। সেদিনের মত আমায় চুমু খাচ্ছিল সে—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু যেই অরুণদা আমাকে চুমু খেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দহিজুড়ির সমস্ত বড় বড় পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে আমাকে তেড়ে এল। আমি ছুটে পালাচ্ছিলাম। ছুটব কী করে? পা ওঠে না কিছুতেই এত ভারী হয়ে গেছে পা। ঘুম ভেঙে গেল… পাঁচ মিনিট বাদে পরীক্ষা। ঘণ্টা বোধ হয় বেজে গেল। বাবার আমাকে জিপে করে পৌঁছে দেওয়ার কথা কিন্তু বাবা আসে না আসে না—ভয়ে বুক ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে গেল ফের।

দহিজুড়ির জঙ্গলে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আকাশ-ছোঁয়া আগুন। ঠিক হয়েছে, পুড়ে মরুক টুলুমাসি। কিন্তু ওকি, ওকি মা পড়ে গেছে আগুনে—মা—মা। ঘুম ভেঙে গেল মায়ের ডাকে। ভোর হয়েছে। কাঁপা গলায় মা ডাকছে—মঞ্জু। নীল আলো জ্বালানো মায়ের ঘরে ঢুকলাম। মা বসে আছে সারারাত যক্ষিবুড়ির মত জেগে—এই অশ্রুনিলয়ের পাপের জ্বালা বুকে করে—মা যেন একটা ভাঙা গাছ তবুও ঝড় যাকে রেহাই দিচ্ছে না। মা বলল, স্বপ্ন দেখছিলি? অত হাড়-বার-করা, অত রোগা

অত জলজলে চোখ—তবু মা কী সুন্দর। মা বলল—কী হয়েছে অত হান্‌ফান করছ কেন?

আমি চুপ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা আমার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল, মাথায় পিঠে হাত বুললো। আমি মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে রইলাম খানিকক্ষণ। কিন্তু কিছু বললাম না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভাবলাম একবার বাবার ঘরে যাই। আহা কাল নিশ্চয় কত খুঁজেছে আমায়। বকবে একটু? তা বকবে, তবে সে ঠোঁট ফুলোলেই আবার আদর করবে এখন। বাবার ঘরে গিয়ে দেখি বাবা নেই। মশারীও ফেলা নেই। ফ্যানটা হু হু করে ঘুরছিল। গোল টেবিলের ওপর এক টুকরো ভাঁজ-করা কাগজ অ্যাসট্রে চাপা দেওয়া। খুলে পড়লাম তারপর চিঠিটা নিয়ে নিলাম।

সিতাংশু—

একটা পনের বছরের মেয়ে বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তিন মাইল বিজন রাস্তা একা ছুটতে ছুটতে যখন বাড়ি চলে আসে, মাকেও জানায় না কী হয়েছে, তখন কনটেক্সট জানা থাকলে এর ব্যাখ্যা দুষ্কর নয়।

আমার সময় আর কত জানি না, শুধু একটা প্রার্থনা তোমার কাছে—আমার ঘরের চৌকাঠ তুমি আর ডিঙিও না। যেহেতু মঞ্জুকে আর আমার কিছু খুলে বলতে হবে না সেহেতু আর adjustment-এর কোন কোন প্রশ্ন নেই। ইতি—অশ্রু।

পোড়া সিগারেটের গন্ধ আসছিল নাকে। অ্যাসট্রে বোঝাই পোড়া সিগারেট। আমি ভাবলাম—যাক অশ্রুনিলয়ের হয়ে গেল—The end.

১৫ই জুন, রাত্রি—

কিন্তু দি এণ্ড হতে দিলে চলবে না। দহিজুড়ির জঙ্গলে যে আগুন জলেছে তা অত সহজে জলতে দিলে চলবে না। আর কী আশ্চর্য আর কিছু জ্বলুক আর নিবুক অশ্রুনিলয়ের একটা মেয়ের বুক পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে খবর কেউ রাখে না। সেদিন যখন বিকেলবেলায় সেজেছিলাম—বট্‌ল গ্রীন রঙের ফ্রকের ওপর সাদা ফিতে দেওয়া বিনুনি ছুলিয়ে কালো

স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি পায়ে গলিয়ে যে আমাকে ধরে ঠ্যাঙালেও গান বেরোয় না আমিও গুন গুন করে উঠেছিলাম। আমি সেজেছিলাম মন দিয়ে, ভেবেছিলাম অরুণদা যাবে দহিজুড়িতে, বেশ অবাক হয়ে যাবে আমাকে দেখে। ভাগ্যিস অরুণদা যায়নি।

এখন ঘোর দুপুরবেলা। গাছের ডালে বসে হাঁ-করা কাক ঝিমোচ্ছে। চারিদিক ফাঁকা। রাস্তায় লোকজন নেই। কখনো-কখনো এক আধটা সাইকেল-রিক্শা ভেঁপু বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার ঘরের জানলায় মুখ রেখে আমি বসে আছি। মাঝে মাঝে শুকনো গরম হাওয়া মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। শুকনো ঠোঁট বারবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছি। ঘরের অন্য জানলাগুলো বন্ধ দুপুরবেলা বলে।

আজ সারাদিন একবারও বইখাতা খুলিনি। পড়ার কথা ভাবিই না আর পূজোর আগে প্রিটেস্ট। পূজোর পরে টেস্ট। কী হবে কে জানে। ওঘরে মা শান্ত হয়ে বসে আছে। কার হাতে সব কিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মা, মা জানে।

আগে আগে মা যখন ভালো ছিল—আমার সব কিছুর দিকে মায়ের নজরের ঠেলায় আমাকে অস্থির হতে হত। ভিজে চুল কেন, ভেতরের জামা পাল্‌টিয়েছি কিনা, কাঁচের চুরি ভাঙল কী করে, অস্থির, অস্থির, অস্থির। আর আজ ক-দিন ধরে যখন তখন মাথায় জল দিচ্ছি কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না বলে—কিন্তু এখন আর কেউ বকবার নেই, দেখবার নেই। এর যে কী কষ্ট তা বোঝাই কী করে নিজেই জানিনে।···এক ঝাঁক শুকনো পাতা ঘুরপাক খাচ্ছে বাগানে। কাকটা দু-বার ডেকে উঠল। ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে রামবিরিজ কোথা থেকে এল একটা ঠোঙা হাতে করে। দুপুর—বিজন নিঝুম দুপুর। এখন ঘুম নেমে আসে সবাইয়ের চোখে। শুধু শ্রীমতী মঞ্জরী সান্যালের চোখ জ্বলছে দহিজুড়ির জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

তবু কেন জানি না মায়ের ওপরই রাগ হচ্ছিল থেকে থেকে। আমি এতদিন ধরে একথাই বিশ্বাস করে এসেছি যে যাই হোক মা সবই ঠিক করে দিতে পারে। মায়ের অসাধ্য কোন কাজ নেই। কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার দেখে আজ

আমার সে বিশ্বাস টলে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যে মা যেন হেরে গেল। অথচ মায়ের গায়ের রঙের এক কণা টুলুমাসির নেই। পাকা মর্তমান কলার মতন গায়ের রঙ মায়ের। সে টুলুমাসি কোথায় পাবে? তবু টুলুমাসি জিতে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? কী আছে টুলুমাসির? টুকটুকে ঠোঁট, টিকটিকে নাক। সে তো কতজনারই আছে। তারা তো অমন বেহায়া নয়। আর কী আশ্চর্য মা যেন সব কিছুই মেনে নিয়েছে। এইটাই আমি সহ্য করতে পারি না। আমার আর আমার বাবার মাঝখানে টুলুমাসি এসে দাঁড়াবে। বাবা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে—আর মা চুপ করে দেখবে এইটাই অসহ্য। ভাবলাম একবার মায়ের ঘরে যাই, মাকে জিজ্ঞাসা করি, খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি যে শুধু চুপ করে থাকলেই হবে? কিছু কি করার নেই? চুপ করে থেকে থেকে আমি যে আর পারিনে। যাকে দেখা যায় না যাকে ধরা যায় না এমন একটা কিছু আমার বুকটাকে যেন চেপে ধরে রেখেছে সব সময়। মাঝে মাঝে মনে হয় চিৎকার করে উঠি কিন্তু পাছে কেউ শুনে ফেলে বলে তাও পারিনে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই রাগ করে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে দেখি আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। 'মা' বলে ডাকলাম। ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে ফ্যাকাসে সাদা মুখখানা ঘুরিয়ে মা সাড়া দিল—কী। মায়ের দিকে তাকিয়ে আমার তখন সব কথা হারিয়ে গেছে। একবার ওষুধের এ শিশিটা নাড়লাম, একবার ওটা সরালাম। তারপর অনেক চেষ্টা করে বুকে যত জোর আছে সব জোর একসঙ্গে খাটিয়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, মা, তুমি টুলুমাসিকে এবাড়ি আসতে বারণ করতে পার না?

ক্লান্ত চোখ দুটো তুলে মা আমার দিকে তাকালো। ওরকম ফ্যালফ্যাল চোখ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। মা বলল—ওটা তো আমার করার কথা নয়, মঞ্জু।

—কেন? তবে কার করার কথা?

—কেন? সে কথা তুমি বুঝবে না এখন। সে বয়স নয়। যখন অনেক বড় হবে তখন ভেবে দেখো, বুঝবে মেয়েমানুষের কাছে সব থেকে বড় কথা তার আত্মসম্মান। ওটা তোমার বাবার করবার কথা
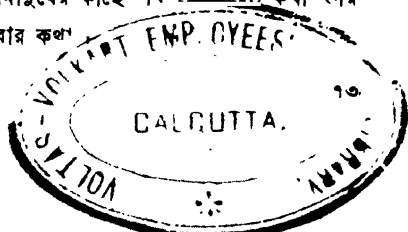
১৬ই জুন—

সত্যিই The end। সব দিক থেকেই দি এণ্ড। ইলু এসেছিল দুপুরে। অকারণে ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। বোকার মত কেবলই জিজ্ঞাসা করছিল, কী হয়েছিল রে? কাল তুই একা একা চলে এলি কেন? যত বলছি বলব না, ও ছাড়বে না। বলতেই হবে। কী জ্বালা। ইলু হঠাৎ বলে কি—তুই ভাবিস কেউ কিছু বোঝে না, সবাই সব জানে রে কিছু বলে না তাই। আমারও রাগ হয়ে গেল, বললাম—জানে তো যা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করগে, আমায় জ্বালাসনে। ইলু বলল—কালকের কথা সারা রূপসাডিহিতে জানাজানি হয়েছে জানিস। সবাই বলছে সিতাংশুবাবুর মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, আরো সব মেলা কথা বলছে। আমি বললাম—বলছে বলুকগে, তোর ইচ্ছে হয় শুনতে তাদের কাছে শুনগে যা, আমার কাছে কেউ কিছু বলিসনে। আমি শুনব না। ইলু বলল—তোকেও তো লোকের কাছে বেরুতে হবে, নাকি? আমি বললাম যে, আমার কানে আমি তুলো দিয়ে আর গায়ে গণ্ডারের চামড়া মুড়ি দিয়ে বেরুব এখন, তোরা আমার জ্বালাস নে তো। ইলু রাগ করে চলে গেল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুপুরবেলার একলা বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিঝুম বাগানে কেউ নেই। শুধু সূর্যমুখীগুলোর ফুর্তির কোন অভাব নেই।

মনমরা মুখ নিয়ে টুলুমাসি এল সন্ধ্যের পর। আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল কী মঞ্জু, কাল কী হয়েছিল?

হাড়পিত্তি জ্বলে গেল শুনে। কী হয়েছিল জানো না তুমি কাল কী হয়েছিল। বললাম চারদিক তাকিয়ে নিয়ে লজ্জা করছিল বড্ড।

—ওমা কেন?

—লজ্জা একেকজনের থাকে, একেকজনের থাকে না, আমার আছে।

—তুমি এর মধ্যেই বড় পেকে গেছ, মঞ্জু।

—একটু আগে পেকে যাওয়া বরং ভালো, টুলুমাসি, তবে পেকে গিয়ে কেঁচে যাওয়া ঠিক কথা নয়।

—সেই জন্যেই তো বলছি তোমার লজ্জা কিসের?

বললাম—তা তো বলতে পারবো না, টুলুমাসি।

—কেন?

জবাব দিলাম— দেখতেও যেমন লজ্জা বলতেও তেমনই। বলে চলে গেলাম। বাবা আর টুলুমাসি বসবার ঘরে বসেছিল। খানিক বাদে ওরা কামিনী ঝাড়ের পিছনে গেল। বেতের চেয়ার দিয়ে এল রামবিরিজ। কী মনে হল—আমি চুপিচুপি কামিনী ঝাড়ের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকটা ধড়ফড় করছিল। মাথাটা করছিল টিপটিপ। যদি আবার সেদিনের মত কিছু হয়।

টুলুমাসি বলছিল—এখানে এভাবে আসা হয় তো উচিৎ হল না, কিন্তু না এসে পারলাম না। সিতাংশুদা, তুমি আমাকে ওয়াদিয়ার ওখানে পাঠিও না।

—কেন?

—আর আমি পারছি না।

—এতদিন যে পারছিলে?

—এতদিন তো আমায় কেউ বলেনি যে, সে আমায় নিয়ে তামাসা করছে না।

একটু চুপচাপ। তারপর বাবার গলা শোনা গেল—পিল্লাই যদি জেতে তাহলে ডুবে যাব টুলু, টুলু শুধু এইবারটা, এইবারটা ওয়াদিয়া যা চায়···শুধু আমার জন্যে। শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম কী চায় ওয়াদিয়া? টুলুমাসির অত প্যানপ্যানানিই বা কিসের—মাথামুণ্ডু সব সময় বুঝতে পারিনে। কান্না কান্না গলায় টুলুমাসি বলল—এই কথাটা আমি কী করে বোঝাব তোমায় যে তোমাকে আর তোমার জন্যে এক কথা নয়।

বাবা ভারি গলায় বললেন—টুলু, ইদানীং তোমার ভাবগতিক আর আমি কিছু বুঝতে পারি না। কী হয়েছে তোমার?

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে টুলুমাসি কাঁদছিল, বলল—কিছু যে হল না, সিতাংশুদা। আহা মরে যাই তোমার আবার হবে কী? হবার বাকি কিছু আছে তোমার, নিজের স্বামীর ঘর করে না যে মেয়েমানুষ সুখদা বলে সে শতেকখোয়ারী।

—কী হবে বল?

—কিছু না, কিছু হবে না। আমি জানি আমার কিছু পাওনা নেই কোথাও। শুধু কেউ যদি একটু ভালবাসে তাহলে বর্তে যাই। রমেশদা এখানে এনেছেই আমায় এইজন্যে। দিদিও রমেশদার দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই আমায় ভাঙাতে চায়। সিতাংশুদা, আর আমায় ভাঙিও না। ওয়াদিয়ার কাছে তুমি আর আমায় পাঠিও না।

আমার ঐ ন্যাকামিগুলো শুনতে শুনতে গা মাথা রি রি করে জ্বলছিল। যম ঠিক আসল লোকগুলোকে ভুলে থাকে টুলুমাসি তার মধ্যে একটা। ছিঃ। চলে আসতে আসতে শুনলাম বাবা বলছে—পিল্লাই যদি ওটা বাগাতে পারে তাহলে ডুবে যাব টুলু।

১৭ই জুন—

আমি যাব ওয়াদিয়ার কাছে। আমি গেলে যদি হত তাহলে নিশ্চয় টুলুমাসির খোসামোদ বাবাকে করতে হত না। আমি বুঝতে পারি না যে ওয়াদিয়ার কাছে যাওয়া নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের। ওয়াদিয়া কি বাঘ—খেয়ে ফেলবে কপ করে। ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়। না হয় তোকে দেখতেই সুন্দর তা বলে অত গুমোর ভালো নয়। আমাকেও অমন ক্লাসের সব মেয়েই খোসামোদ করে, দিদিদের কাছে কিছু একটা আদায় করতে হলে আমাকেই পাঠায়। তোমার ইচ্ছে হয় যাও না ইচ্ছে হয় না যাও, আমার বাবাকে ভাঙিয়ে নেওয়া কেন বাপু। অত ঢং ভালো নয়। শাড়ি পেয়েছ সোহাগ পেয়েছ তবে আবার যাব না যাব না করে আদর কাড়ানো কেন? মঞ্জু সব দেখতে পারে—শুধু ন্যাকামো দেখতে পারে না।

এক এক সময় মনে হয় যদি আমি যাই ওয়াদিয়া সায়েবের কাছে। আমি চিনি কোথায় বাড়িটা। ঐ—ওই তো কৌশল্যাদের বাড়ির ওধারে—এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই পাওয়া যাবে—মস্ত বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা মস্ত বড় বাড়ি, যেখানে একটা বিরাটকায় অ্যালসেশিয়ান হেঁড়ে গলায় রাতদিন ঘেউ ঘেউ করে—সেই বাড়িটা। ওয়াদিয়া সায়েব সকাল বেলায় ড্রেসিং গাউন পরে কম্পাউণ্ডে পায়চারি করে। ছ-ফুট লম্বা ওয়াদিয়া সায়েব। রুখু রুখু চুল আর মুখে একটা চুরুট। ওয়াদিয়া সায়েবের কুকুরটা বাগানময় ছুটোছুটি করে আর পাদরি মেমদের মত সাদা আলখাল্লা পরা বাবুর্চি চিৎকার করে ডাকে 'জলি—কাম্ হিয়ার!'

মা তো বিছানাবন্দী। বাবা টুলুমাসি নিয়েই বিভোর। যদি একদিন সকাল বেলায় চুপি চুপি কৌশল্যাদের বাড়ি যাচ্ছি বলে চলে যাই কেউ টের পাবে না। সকাল বেলা কৌশল্যা থাকবে পড়ার ঘরে। সেও দেখতে পাবে না। কী অত টুলুমাসির খোসামোদ। সুন্দর মুখ দেখলে ওয়াদিয়া সায়েব গলে নারকোল

তেল হয়ে যায় এই তো। তা সুন্দর কি মা আমার কম নাকি? মায়ের মতন রঙ পেতে হলে টুলুমাসিকে সাত জন্ম ঘুরে আসতে হবে। তারপর তার চুল? মায়ের মত চুল টুলুমাসিকে বেচলেও হবে না। আর একথা কে না জানে যে আমি দেখতে হুবহু মায়ের মতন। শুধু নাকটুকু ছাড়া। তা অত কেউ খুঁটিয়ে দেখে না।

কিন্তু আমার কি যাওয়ার উপায় আছে? যক্ষি বুড়ির মতন মা সব সময় আগলে আগলে রাখে আমায়। নিজে পারে না সুখদাকে দিয়ে খোঁজ রাখে। এরই ফাঁকতালে অরুণদা যে কী করে চমুটা খেয়ে নিল সেটা আশ্চর্য। দহিজুড়ির জঙ্গলে যদি অরুণদা যেত তাহলে⋯ছিঃ কী অসভ্যের মত যা-তা ভাবছি। সব সমান যেমন বাবাটি তেমনি অরুণদাটি।

আজকের দিনটা আমার 'যদি' ভাবার দিন। যদি যদি করেই কেটে গেল আমার আজ সারা দিন। যদি সেই হালকা নীল রঙের পাইপিং জর্জেটটা পরতাম, ট্যাসল দিয়ে বিনুনি ঝুলিয়ে দিতাম পিঠের অনেক নিচে, রঙ মাখতাম ঠোঁটে, গায়ে দিতাম সাদার ওপর চিকণের কাজ করা লম্বা হাতা ব্লাউজ। যদি চপি চপি চলে যেতাম সেই মস্ত বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা মস্ত বড় বাড়িটায়—যেখানে অ্যালসেশিয়ান চেঁচিয়ে গলায় ঘেউ ঘেউ করে। পায়ে থাকত সাদা রঙের স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যাণ্ডেল, সুন্দর করে পরতাম আলতা।

যদি ওয়াদিয়া সায়েব আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যেত, যেমন নাকি প্রথম টুলুমাসিকে দেখে হয়ে গিয়েছিল। যদি জিজ্ঞাসা করত ওয়াদিয়া সায়েব —কী চাই খুকি?

আমি যদি বলতাম—সায়েব তুমি আমার বাবার কন্ট্রাক্ট কেড়ে নিও না, তুমি জানো না বাবার আমার তাহলে বড় লোকসান হবে।

আর যদি ওয়াদিয়া সায়েব তখন আমার মাথায় হাত রেখে আমায় বলত যে—ঠিক আছে খুকি যাও, তোমার বাবার কন্ট্রাক্ট আমি কেড়ে নেব না। তারপর তাহলে আমি কাউকে কিছু বলতাম না। বাবা ওয়াদিয়া সায়েবের কাছে শুনত যে কে একটা ছোট মেয়ে গিয়ে কাজ সেরে এসেছে। তখন ⋯তখন নিশ্চয় বাবার মনে হত এ আর কেউ নয়, মঞ্জু। তাহলে টুলুমাসির খোসামোদ বাবাকে আর

করতে হত না। আমি দেখতাম তখন বাবা কি বলে টুলুমাসির সঙ্গে মেশে। যদি সব যদি-গুলো সত্যি হত। কিন্তু একটা কথা—তাতে সত্যিই কি কিছু লাভ হত? বাবা টুলুমাসির সঙ্গে মেশে শুধু কি ওয়াদিয়া সায়েবের জন্যেই? নিশ্চয় না। কিন্তু আমি যে জানি টুলুমাসির চোখে চোখ পড়লে বাবা যেমন করে হাসে কই আর কারো চোখে চোখ রেখে বাবা তেমন করে হাসে না। টুলুমাসিই শুধু বাবার বুকে মাথা ঘষে না, বাবাও যে চুমু খায়। যদি টুলুমাসিটা এখানে না থাকত—যদি সব যদিই সত্যিই হত। যদি ফুসমন্তরে দহিজুড়ির দিনটা স্বপ্ন হয়ে যেত।

১৮ই জুন—

অশ্রুনিলয়ে তিনটে সমান্তরাল রেখা। জ্যামিতিতে পড়েছি: সমান্তরাল রেখারা কখনো কারুর সঙ্গে দেখা করে না। বাবা বাবার ঘরে। মা মায়ের ঘরে। আমি আমার ঘরে। মায়ের ঘর দিয়ে যাই, কথা বলি না। বাবার চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিই। অনেক রাত অবধি বাবা জেগে থাকে। কোল বারান্দা দিয়ে দেখতে পাই বাবার ঘরের আলো নেভে না। শব্দ পাই কর্ক খোলার। শব্দ পাই গ্লাসের আলতো টুংটাং। বুঝতে পারি বাবা জেগে আছে। আজ একটু আগে মা ডেকেছিল। আবার সেই বাবার চিঠির বাক্সটা দিতে বলল, দিলাম। পর্দা সরিয়ে এ ঘরে চলে আসার সময় দেখি মা বাক্সটা হাতে করেই বসে আছে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, খোলেনি। খানিক বাদে আমার ঘর থেকেই বুঝতে পারলাম আমার মা—আমার পঁয়ত্রিশ বছরের মা—ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।
যা ভাবছি তাই যদি করতে পারতাম। মাথার ভেতরটা মাঝে মাঝে ঝিম ঝিম করে। কত রাত অবধি জেগে থাকি। ঘড়ি বাজে মায়ের ঘরে— এগারোটা, বারোটা, একটা।

১৯শে জুন—

সকলেই জানে—ইলু ঠিকই বলেছে সকলেই জানে। রামবিরিজ ভগীরথ ওরা কী কথা বলছিল আজ পাম গাছতলায় বসে? আমাকে দেখে থেমে গেল

কেন? ওরা কি জানে তাহলে সব? রূপসাডিহির ঘরে ঘরে কারুরই জানতে বাকি নেই মঞ্জুর বাবার কথা? ক্লাসের মেয়েরা বলত মঞ্জুর ডাঁট খুব, সেই ডাঁট এইবার ধুলো হয়ে গেছে—সে খবর সবাই জানে। জানে বলেই তো ক-দিন হল স্কুল খুলে গেছে তবু যাইনে, বাড়িতেই বসে থাকি। অরুণদা, অরুণদাও কি জানে? নিশ্চয় জানে তা না হলে আসছে না কেন? আসে না ভালোই হয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করে কিছু—মাথা কাটা যাবে লজ্জায় তাহলে। যে যা খুশি ভাবুক, যা খুশি বলুক—অরুণদাও যা খুশি ভাবুক শুধু সে যেন কিছু না বলে, না বলে।

বাবার দিকে তাকাতে গেলে চোখের পাতা কেঁপে যায়। কেন যায়? কেন আমি সটান তাকাতে পারি না বাবার চোখে চোখ রেখে—মা যেমন মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকায়। যাতে করে বাবা থমকে দাঁড়িয়ে যাবে, কথা বলতে পারবে না ভয়ে। কেন পারি না? বাবা যে, সেই জন্যে পারি না। যে দাপট নিয়ে হুকুম করতাম রামবিরিজকে সুখদাকে সে দাপট আমার গলা দিয়ে আর বেরোয় না, কেন বেরোয় না? বকলে ওরা চুপ করে থাকে বটে কিন্তু মনে মনে যেন বলে—অত তেজ কিসের তোর আর ঠিক সেই সময় আমার মনে হয় টুলুমাসি একটা রাক্ষুসী—অশ্রুনিলয়ের সব রক্ত যে চুষে খাচ্ছে। টুলুমাসির পুরন্ত বুক আর টকটকে ঠোঁট দেখে যদি কেউ আমার মায়ের শুকনো মুখ আর শুকনো বুকটাকে দেখে তবে সে'ও তাই বলবে। আজ মায়ের কাছেও বকুনি খেয়েছি, মনটা ভালো নেই। মায়ের প্লেট থেকে পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে জানলার কাছে চড়াই পাখিদের দিচ্ছিলাম। প্রায়ই দিই মা দেখে। আমার ভালো লাগে। আজ কী মনে হল মায়ের টেবিল থেকে বিষ বলে লেখা একটা নীল ওষুধের শিশি খুলে চুপিচুপি একটু ওষুধে এক টুকরো পাঁউরুটি ভিজিয়ে নিলাম। চড়াই পাখিদের দিকে টুকরোটা যেই ছুঁড়ে দিয়েছি মা এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ফেলেছে ব্যাপারটা। মায়ের অমন জ্বলন্ত চোখ আমি অনেক দিন দেখিনি। মা বলল—কী হয়েছে তোমার?

ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেছে তখন।

—কী আবার হবে?

মা খুব বকল, বলল—ছেলেমানুষি কোরো না, মনটাকে নোংরা করে ফেলো না

তা সে—অন্যদিকে তাকিয়ে মা বলল—যত নোংরাই চারদিকে থাক না কেন। ছেলেমানুষি কোরো না।
বুড়োরা ছেলেমানুষি করলে কিছু নয়, কেবল আমি ছেলেমানুষি করলেই রাগ। বেশ করব, করব। কিন্তু চড়াই পাখিরা তো খেল না টুকরোগুলো। আমার কি কোনদিকেই একটা কিছু এ সংসারে মনের মত হবে না। এক টুকরো পাঁউরুটি একটু জিভে ঠেকিয়ে দেখলে হয় কিন্তু যদি কিছু হয়। থাকগে বাবা।

২১শে জুন—
সারারাত মায়ের চোখ নিঘুম। ফ্যান শোঁ শোঁ করে, ঘড়ি টক্‌টক্‌। মায়ের শুকনো চুল ওড়ে। মায়ের নিচের দিক অসাড়। মায়ের বুকের মধ্যে হু হু জ্বালা। মায়ের মাথার মধ্যে ধু ধু যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে মা বলে মাথাটায় হাত বুলিয়ে দে। হাত বুলিয়ে দিই আর ভাবি মা আর কতদিন বাচবে? আর কেন বাচবে? বাবা আর মায়ের ঘরে আসে না। শুকনো মুখে কত রাত অবধি বাবা পায়চারি করে বাগানে। দোতালায় মায়ের ঘর থেকে যে আলোর টুকরোটা বাগানে পড়ে সেই চৌকো আলোটুকুকে এড়িয়ে এড়িয়ে গিলাডিয়ার পাশে পাশে সূর্যমুখীর ধারে ধারে বাবা ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে। আকাশে তারাগুলো দপ দপ করে জ্বলে। শুধু গাছপালাগুলো দারুণ গুমোটে থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কী যেন একটা হবে-হবে মনে হয়। দারুণ কিছু একটা হবে, হয়ে এই অশ্রুনিলয়ের গুমোট ছিঁড়ে যাবে। হে ভগবান তাই যাক্‌, আর পারি না যে।

২২শে জুন—
'টুলু, তুমি আর ওয়াদিয়ার কাছে যেও না।' কাল বাবা বাবার ঘরে বসে বলছিল এই কথা টুলুমাসিকে আর আমি শুনছিলাম পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে। দেখি টুলুমাসি কী বলে। ঘোর ঘোর বিকেল, বাবার শুকনো মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। কাল রমেশকাকু এসেছিল। কী সব কথা হল সব বুঝিনি, তবে এটা বুঝলাম রমেশকাকু টুলুমাসির ওয়াদিয়ার কাছে না যাওয়াটা ভালো চোখে দেখছে না। বাবা টুলুমাসির মতেই মত দিয়েছে। রমেশকাকু

বলছে—তাহলে হাতে দড়ি পড়বে, সবসমেত ডুবে যাব সিতাংশুদা। বাবা বলছে—না, টুলু নিজে থেকে যেত সে আলাদা কথা। ও যখন না বলেছে তখন না-ই। আজ বাবা টুলুমাসিকে ডেকে বলে দিল—তুমি আর ওয়াদিয়ার কাছে যেও না। আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম দেখি টুলুমাসি কী বলে? টুলুমাসি বলল—তোমরা যে তাহলে পিল্লাইয়ের কাছে হেরে যাবে।

ঢং। আমি সব দেখতে পারি ঢং দেখতে পারিনে। তবে যা তুই—এই কথা মনে মনে বলে চলে এলাম ওখান থেকে। নিচে যাবার সময় মায়ের ঘরের পর্দাটা ভালো করে টেনে দিলাম। মায়ের ঘরের সামনে দিয়েই টুলুমাসি নিচেয় যাবে মা যেন দেখতে না পায়।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে দেখি অরুণদা লাল সিঁড়ির নিচে পাম চারার টবের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছিল। হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্ত লাফিয়ে উঠল আমার মাথায়। ভাবছিলাম সিঁড়িটায় কেউ নেই। একা একা আমরা। সুখদা কোথায়? একটু যদি নজর রাখে কোনদিকে। মা পড়ে রয়েছে, তোমার হাতেই সব ভার বাপু। খুব ভালো লাগছিল অরুণদা এসেছে বলে, আর ভয় করছিল কেন জানি না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি কিছু বোঝা যাচ্ছিল? অনেক দিন বাদে অরুণদা এল।

আমি শুধু বললাম—তুমি। আমার বুক ধক ধক করছিল। এত জোরে করছিল যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

অরুণদাও কি শুনতে পাচ্ছে? এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলাম। কী বলব কী বলব বললাম—কী গরম পড়েছে।

অরুণদা বলল—আমি অনেক দিন আসিনি।

বললাম—হুঁ।

ও বলল, কেন আসিনি জিগ্যেস করলে না তো?

আমি একটু ঢোঁক গিলে বললাম—আমি জানি কেন আসোনি।

—কেন?

—পাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়।

অরুণদা বলল--সত্যি জানো, সেদিন ইলুর কাছে সব শুনে এত খারাপ লাগছিল কী বলব!

আমি তখন মনে মনে হয়ে গেছি—কী বলেছে ইলু কে জানে।

অরুণদা বলল—তুমি একলা অতটা রাস্তা ফিরেছ শুনে বড় মন কেমন করছিল তোমার জন্যে।

আমি কি বলব ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার জন্য অরুণদার মন খারাপ হয়েছিল? চোখে তখন জল আসি আসি করছে—অন্যদিকে তাকিয়ে পামগাছের পাতা ছিঁড়ছিলাম কুটি কুটি করে। আমার মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে ও বলল—মঞ্জু।

আমি বললাম—অরুণদা আর……আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল যে অরুণদা আচম্‌কা আমায় জড়িয়ে ধরুক, একহাতে আমার চিবুকটা তুলে ধরুক, দুটো কি তিনটে চুমু খাক আমাকে। আমি মাথা ঘষি ওর বুকে তারপর ও আমাকে ছেড়ে দিক। সকালে পরেছিলাম একগোছা কাঁচের চুড়ি ডানহাতে। সে দিকে তাকিয়েছিলাম—কিন্তু নাঃ সেসব কিছুই হল না. রেলিঙে ধাক্কা লেগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল কতকগুলো চুড়ি সিঁড়ির ওপর। অরুণদা বলল—মঞ্জু কী হল।

রেলিঙ ধরে টাল সামলে টলতে টলতে চলে এলাম নিজের ঘরে। কী যে হচ্ছিল কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হিম হয়ে গেছে গা হাত পা। বড ভয় করছিল। নিজেকে ভীষণ বোকা বোকা মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সবাই বুঝতে পারছে আমার মনের কথা—অরুণদাকে মুখ দেখাব কী করে। মায়ের কাছে দাঁড়াব কী করে। খানিকক্ষণ বাদে মনে পড়ল সুখদা দেখে গিয়েছিল আমরা সিঁড়ির নিচেয় কথা বলছিলাম। তাই চুড়ির ভাঙা টুকরোগুলো দেখলে ও কী ভাববে ভেবে ওখান থেকে কুড়িয়ে আনতে গেলাম। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছিল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছি, যেই নামতে যাব শুনতে পেলাম সিঁড়ির নিচেয় যেখানে একটু আগে আমি আর অরুণদা কথা বলছিলাম সেখানে বাবা আর টুলুমাসি। টুলুমাসির কাঁধে বাবার হাত—বাবা বলছিল—তুমি আবার যাবে ওয়াদিয়ার কাছে এটা ভালো লাগছে না—এমনিতেই তোমার কাছে রমেশের কাছে, অশ্রুর কাছে আর সবচেয়ে বেশি মঞ্জুর কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে গেল টুলু। কারুর দিকেই আমি মুখ তুলে কথা বলতে পারছি না। আমি মনে মনে বলছিলাম টুলুর কাছে মঞ্জুর কথা বলে আর

সোহাগ কাড়াতে হবে না। ……… · ……সবাই হয়তো ভাবে আমি কিছু ভাবি না, বুঝি না, ভুল কথা সবই বুঝি কিন্তু বুঝেও তো কিছু করে উঠতে পারি না। কেন পারি না ? (আমি ভাবলাম ছাই বোঝো তুমি।)

—তুনিয়ার একটা কেনরও যদি কোন কিনারা হত।

—টুলু, আমিও আর সহ্য করতে পারছি না।

একটুখানি মুখ বাড়িয়ে দেখি বাবা টুলুমাসির তুই কাঁধে হাত রেখেছে। আবার আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। দহিজুড়ির জঙ্গলের হাজার হাজার কৃষ্ণচূড়া দপ দপ করে জ্বলে উঠল যেন আমার চোখের সামনে, একসঙ্গে যেন হাজার ঝিঁ ঝিঁ ডেকে উঠল আমার কানে. আমি শক্ত করে রেলিঙটা চেপে ধরে চিৎকাব করে উঠলাম—রামবিরিজ। রামবিরিজ যেই ফটক থেকে সাড়া দিল—গৌকিদিদি। আমি বললাম—ইধার আও।

বাবা চমকে উঠেছে, টুলুমাসি সাদা হয়ে গেছে তখন ভয়ে। আমি নেমে গেছি তু-ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সিঁড়ির মোড়ে। ঠিক—আজ ঠিক বাবার সামনেই রামবিরিজকে হুকুম দিতাম—টুলুমাসিকো গেটকো বাহার নিকাল দো।

বাবা ডেকে উঠল—মঞ্জু।

আমি বাবাকে গ্রাহ্য না করেই যেই বলতে গেছি 'রামবিরিজ' অমনি ক্রিং ক্রিং করে কলিংবেল বেজে উঠল বারান্দায়। সুখদা সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—মঞ্জু, মা ডাকছেন। মা ডাকছেন, মা ডাকছেন --যত নষ্টের মূলে মা। এরা কেউ একটা কাজ আমায় ঠাণ্ডা মাথায় করতে দেবে না। টলতে টলতে আবার ঘরেই ফিরে এলাম। রাগে তখন আমার সারা শরীর জ্বলছে। কেউ ভালো নয়—মা, বাবা, টুলুমাসি অরুণদা কেউ ভালো না—কিন্তু সব থেকে খারাপ, সাপের মত শয়তান যে সে হল টুলুমাসি।

২৩শে জুন—

আজ বিকেল বেলায় আবার অরুণদা এসেছিল। কিন্তু কাল রাত্তিরের ঘটনার পর থেকে মনটা এমন কালো হয়ে আছে আমার যে বলার নয়। অরুণদাকে ভালো লাগে কিন্তু তার সব কিছুই আমার ভালো লাগছে না আর।

সত্যি কথা বলব তাতে লজ্জা কী, অরুণদা যেদিন আমায় প্রথম চুমু খেয়েছিল সেদিন যাই বলি না কেন আমার ভালোই লেগেছিল কিন্তু দহিজুড়ির জঙ্গল থেকে ফেরার পর থেকে ও কথা মনে করতেই আমার কেমন গা ঘিন ঘিন করছে। তারপর থেকে যখনই আমি সেদিনের কথা ভাবতে যাচ্ছি অরুণদার মুখখানা বাবার মুখের মত মনে হচ্ছে আর আমাকে মনে হচ্ছে টুলুমাসি। আমার কাছে এখন আর কেউ ভালো নয়। বাবা নয়, অরুণদা নয়, টুলুমাসি নয়, এমনকি আমিও নয়। শুধু মা ভালো। যত চারদিকে গোলমাল, তত মনে হয় মায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয় চলে যাই কোথাও মাকে নিয়ে। না হয় সাহারানপুরেই যাই। কাকা কাকিমাদের ওখানে। রূপসাড়িহি বিষ লাগে আমার কাছে।
কালকে সিঁড়ির মুখ থেকে অরুণদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ পালিয়ে আসায় অরুণদা বোধ হয় কিছু ভেবেছে। তাই আজ বিকেলে এসেছিল ও। বাগানে ঘুরে ঘুরে আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। ভুল বললাম, আমি কিছুই বলছিলাম না। কেবল হুঁ হ্যাঁ করছিলাম। আর অরুণদা বলছিল এমন সব কথা যার কোন হাতা-মাথা আমি কোনদিন খুঁজে পাইনে। জামরুল গাছের পাশ দিয়ে জাম গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর অরুণদা এসে হাজির হলাম রান্নাঘরের পেছনে। অরুণদাটা ভীষণ বোকা আর আমার মরণ দশা। ও যেই কথা বলতে বলতে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখেছে আমার আমি ওর হাতখানা এক ঝটকা দিয়ে নামিয়ে দিলাম। তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সিঁড়ির মুখে বাবা আর টুলুমাসি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল কাল ঠিক এমনি করে। রেগে গেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান কোনদিনই থাকে না। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাওয়া অরুণদাকে বলে বসলাম—যখন তখন গায়ে হাত দাও কেন বলত অরুণদা, ভালো লাগে না। ওর টিকোল নাক, কোঁকড়া চুল চওড়া কপাল কিছুর দিকে তাকিয়েই তখন আমার মায়া হল না।
অরুণদার মুখখানা চষে ফেলে দেওয়া আইসক্রিমের মত হয়ে গেল। আমি সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর আস্তে আস্তে অরুণদা চলে গেল গেট পেরিয়ে বাইরে।

ক-দিন আগে একদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে অরুণদা চলে গেলে পর আমার কান্না পেয়েছিল বড্ড। কিন্তু সে কান্না অন্যরকম কান্না। আজ মনে হল এ কী করলাম আমি। মনে হল একবার চিৎকার করে ডাকি—অরুণদা! মনে হল আমি যেন ঐখানেই লুটিয়ে পড়ব। মনে হল বলি, তুমি যেও না, তাহলে বড় মন কেমন করবে। অনেক দূরে পরিহাটীর মাথায় প্রথম তারা ফুটেছে তখন। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবলাম বড় একলা হয়ে গেলাম এবারে—বড় একলা। আমাকে কেউ ভালবাসে না, কেউ না।

আর এখন এত রাত্রে বসে বসে লিখতে লিখতে দু-বার আমার লেখা থামিয়ে উঠে যেতে হয়েছে। চোখ ধয়ে আসতে হয়েছে। দু-বার চোখের জলে লেখা চুপসে গেছে। কখনো মনে হচ্ছে অরুণদাকে একটা চিঠি লিখি, কখনো মনে হচ্ছে মাকে গিয়ে সব কথা বলি।

কখনো মনে হচ্ছে অরুণদার কাছেই চলে যাই লুকিয়ে লুকিয়ে। গিয়ে বলি যে অরুণদা আমি না হয় ছেলেমানুষ, তুমি তো কত বোঝো কত জানো তুমি রাগ কোরো না। আমার মাথার ঠিক নেই। দহিজুড়ির জঙ্গলের ঐ ব্যাপারের পর আমি কিছুই ঠিক করে ভাবতে পারছি না। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সবই যেন ভুল হয়ে গেল। অরুণদা তুমি শুধু ওরকম কোরো না। ওরকম যারা করে তাদের আমি ভালবাসি না। একটু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। মাথাটা ধরেছে বড়, হাওয়া লাগাচ্ছিলাম মাথায়। ফাঁকা নির্জন ইলেক্‌ট্রিক আলোজ্বালানো রাস্তায় কেমন কান্না কান্না ভাব। দু-পকেটে হাত পুরে মাটির দিকে তাকিয়ে একা একা হেঁটে হেঁটে বাবা বাড়ি ফিরলেন।

২৯শে জুন, দুপুর—

মায়ের মুখ শুকনো সাদা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। রোগা দড়ির মত মায়ের শরীরে শুধু জ্বলজ্বল করে চোখ দুটো। আমার এখন মায়ের কাছে বসার সময় কম। আমি অন্য কথা ভাবছি—বিশেষ করে আজ দুপুর থেকে। যা ভাবছি তা বলার নয় লেখার নয়। একটু একটু করে ভাবনাটা আমার মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারছি না। সেই

জন্যেই মায়ের কাছে যাচ্ছি না।

মায়ের কাছে গেলে মা ধরে ফেলবে। আজ এখন বাবা বাড়ি নেই, এখুনি বাবার ঘরে গিয়েছিলাম, কাল টুলুমাসি ওদের বাড়ির চাকরকে দিয়ে কী চিঠি পাঠাল বাবাকে সেটা দেখার জন্য মনটা ছটফট করছিল। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটায় চাবি দেওয়া থাকে না। আজ দেখলাম চাবি দেওয়া রয়েছে। বুঝলাম তাহলে ঐখানে চিঠিটা আছে। আমার ড্রয়ারের চাবিটা দিয়ে খোলা যায় কি না দেখলাম। কী ভাগ্যিস একটু টানা-হেঁচড়া করতেই খুলে গেল ড্রয়ারটা। সামান্য খুঁজতেই চিঠিটাও পেয়ে গেলাম। সঙ্গে রয়েছে আরো একটা চিঠি—আগে সেই ছোট চিঠিটা খুললাম। দেখি বাবার লেখা। চিঠিটা শেষ হয়নি। মাকে লেখা হচ্ছিল—বাবা লিখছেন– অশ্রু, কোনদিকেই আর আমার কূল নেই। রমেশের খবর যদি সত্যি হয় তাহলে ভরাডুবির আর দেরি নেই। আমি তোমাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। কেননা আজ আমি যা করব—এইখানেই চিঠিটা শেষ, আর লেখা হয়নি। চিঠিটার পাশে রয়েছে একটা ছোট্ট শিশি। রবারের টুপি-লাগান মুখ। লেবেলে লেখা রয়েছে—বিষ। ভাবলাম মরুকগে যাক্ দেখি টুলুমাসি কী লিখেছে। টুলুমাসি যা লিখেছে তা এই—

সিতাংশুদা, আমি ওয়াদিয়ার কাছে যাবো ঠিক করেছি। কেন ঠিক করেছি সেই কথাটা বলার জন্যেই এই চিঠি। সিতাংশুদা, আমাতে তুমি কী দেখেছ তুমিই জানো। তবে আমার মনে হয়েছ যে তুমি আমায় ভালবাস। উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তোমার, আমি ওসব প্রশ্ন করা অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কই তুমি তো আমায় কখনো জিজ্ঞাসা করনি, কেন আমি স্বামীর ঘর করি না ; কেন আমি রমেশদার এখানে এসে দাবার বোড়ের মত এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ? সে সব কথা তুমি জানো না বলে আমি কেন ওয়াদিয়ার কাছে যাব তাও তুমি জানো না।

সতের বছর বয়সে বিয়ে হল আমার। মঞ্জুর চেয়ে কতই বা বড় হব তখন। সতের বছর বয়স অবধি অনেক কিছু পেতে পেতে যখন বিয়ে হল, আদর করবার, ভালবাসবার মত বর পেলাম, সত্যি বলছি পাওয়াটাকে তখন খুব একটা বড় পাওয়া বলে মনে করতে পারিনি। মনে করেছি আরো অনেক কিছুর সঙ্গে

ওটা আমার ন্যায্য পাওনা। বিয়ের সময় ঠিক বুঝতে পারিনি। বিয়ের পর এক বছর বাদে যখন বিধবা হলাম তখনই ঠিক সত্যি সত্যি বুঝলাম বিয়েটা কী ?

বাপের বাড়ি ফিরে এলাম। দিনকতক আহা আহা শুনলাম, তারপর উহু উহু, তারপর শুনলাম উঃ কী ঝামেলা। আকারে ইঙ্গিতে ভাজেরা বুঝিয়ে দিলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করাই ভালো। তুমি বোধহয় শুনেছ সিতাংশুদা, আজকাল ভালো মেয়েরা আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হয়ে থাকা পছন্দ করে না। আমি খবরটা জানতাম না। আমার মেজ ভাজের কাছে একদিন কথাটা শুনলাম। মেজ ভাজের শিক্ষাদান পদ্ধতিটা সেকেলে তাই নরম করে কিছু বলেননি তিনি। কাজেই ট্যুইশনি করে আই-এ পাশ করলাম দু-বারে। তারপর কি করে চাকরি যোগাড় করলাম একটা মার্চেন্ট আপিসে কী করে আলাপ হল আমার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে সে কথা অবান্তর এখানে। তখন চাকরি করি কাজেই স্বাধীন। এঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম ময়দানে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায়। তখন আমার আটাশ বছর বয়স। আটাশ বছর বয়সে মেয়েরা আর বাজে কথায় বিশ্বাস করে না কিন্তু আমি একটু অন্য ধাতের বলেই বোধহয় আবিষ্ট মুহূর্তের যত ঘনিষ্ঠ কথা শুনতাম তাঁর কাছে আর আমার ইচ্ছা করত সে সব কথা বিশ্বাস করতে। সতের বছর বয়সে আমার চোখ ভালো করে খুলতে না খুলতেই যে জিনিস আমাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেছে, তাকে আমি তখন আটাশ বছর বয়সে আবার ধরতে চাই। আমি তাঁকে উসকাতে লাগলাম সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল। বিধবা বিয়ে করলেন আমার স্বামী। করানোর মূলে যদিও আমি, বাহবা পেলেন তিনি বন্ধুদের কাছে, শ্রদ্ধা পেলেন ছোটদের কাছে, হিরো হলেন তিনি। আমাকে উদ্ধার করলেন।

আলাদাই থাকতাম আমরা। সেবার জেঠতুতো দেওরের বিয়েয় জেঠশ্বশুরের বাড়িতে সবাই জড়ো হয়েছি চুঁচড়োয়। আত্মীয়স্বজন অনেকেই জড়ো হয়েছেন। আমিও খুশি। উৎসবে খুশি হয় না এমন মেয়ে কে আছে ? কিন্তু আমার সমস্ত খুশির আলো কালি হয়ে গেল যখন দেখলাম বধূবরণের সময়, দুধ উথলানোর সময় আর সমস্ত বউদেরই সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে বাদ পড়ছি কেবল আমিই। প্রথম ভাবলাম ভুল হচ্ছে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বারে আর ভুল ভাবলাম না।

ঠিকটাই ভাবলাম—ঠিকটা বাড়ির একজন দূরের আত্মীয় আমাকে বলেই দিল – আমি তো ঠিক ঠিক সধবা নই। বিয়ে মিটে গেল। আমরা আমাদের খড়দার বাসায় চলে এলাম। আমার স্বামীর বন্ধুমহল অনেক বড়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতেয় নিমন্ত্রণ লেগেই থাকত। কিন্তু আমি সর্বত্রই ভীত হতাম। মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে—তাই দিয়েই আমি বুঝতাম কোন ক্ষেত্রেই আমার ভয় অমূলক নয়।

এই সময় আর এক ব্যাপার হল। আমার এক বিধবা ননদ আমাদের বাসায় এসে থাকলেন দিনকতক। বৈধব্য খণ্ডন হবার নয় এমন ধরনের আজগুবি গল্প তিনি চালু করলেন আমাদের ছোট্ট সংসারে। একাদশীর দিন আমার দিকে এমন করে তাকাতেন তিনি সেভাবে আমরা একমাত্র বেড়ালে মাছ চুরি করে খেলে তার দিকে তাকাই। হেসেই উড়িয়ে দিতাম কারণ আমি হাসতে পারি। কিন্তু মুশ্‌কিল হল এইবার আমার স্বামীও বিশ্বাস করতে লাগলেন আমি বিধবা আর ভাগ্যটাও আমার এমন যে এইসময় তিনি চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা মচকে পড়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মে। আঘাত কিছু গুরুতর ছিল না। দিনকতক হাসপাতালে থাকলেন। ভয়ে ভয়ে তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সামান্য জ্বরেই দেখতে লাগলেন মৃত্যুর ছায়া, সে এক মর্মান্তিক প্রহসন। হাসপাতাল ছাড়লেন দিন পনেরো বাদেই—কিন্তু ভয় তখন জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে। মফস্বলের মানুষ অনেক কষ্টে কলকাত্তাই সাহস দেখিয়েছিলেন—আর পারলেন না। আমি বোঝাতে পারবো না সিতাংশুদা, সেই কটা মাসের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। আমাকে আমার স্বামী ভয় করছেন—এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর নেই। আমার আর ভালো লাগল না। সম্ভবও ছিল না আর। আটাশ বছর বয়সে আর adjustmentও হয় না। একই ঘরে কখনও বা একই শয্যায় দুটো প্রাণী থাকবে অথচ একজন আর একজনের ভয়ে ভীত হচ্ছে এর চেয়ে সরে পড়া ভালো। স্বামী আস্তে আস্তে মাদুলী ধারণ অভ্যাস করলেন। নানারকম শান্তি স্বস্ত্যয়নের আশ্রয় নিতে লাগলেন। বিয়ের আগের প্রেমের আগুন যতদিন ছিল ততদিন একরকম, সে আগুন যেই নিভে গেল দেখা গেল এক মুঠো ছাই পড়ে রয়েছে শুধু। এই রকম অবস্থায় স্বামী ঠিক করলেন খড়দার বাসা তুলে দেবেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকা হবে চুঁচড়োয়। খড়দায় যদিবা ব্যাপারটা সীমার মধ্যে ছিল চুঁচড়োয় সেটা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে এ আমি বুঝলাম। আর সে অভিজ্ঞতাও তো ছিল আমার। চুঁচড়োয় যাওয়ার হেতু দেখালেন আমার স্বামী যে আমার শরীর খারাপ—ছেলেপিলে হবে। আমি চুঁচড়োয় যেতে নারাজ হলাম। কিন্তু আমার স্বামী তখন বদ্ধপরিকর। চুঁচড়োয় তিনি যাবেনই। তিনি গেলেন। শরীর খারাপ অজুহাতেই আমি চলে এলাম দাদার বাড়ি। তখনও আমি কিছু ঠিক করিনি। তারপর জীবন-মরণ টানা-টানির ভেতর দু-দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়ে যখন দেখলাম পেটের ছেলেটাও মরা—এবং সে ছেলেটাকেও একবার চোখের দেখা দেখতে আমার স্বামী বা আমার শ্বশুর বাড়ির কেউ আসেনি তখনই আমি সব ঠিক করে ফেললাম। তাই—তাই, আজ আমি এখানে।

তিন আইনের বিয়ে—ঠিক করলাম আমি আলাদাই থাকব।

তারপর আমার স্বামীর প্রার্থনা অনুযায়ী আমি তাকে মুক্তি দোব। তাই আমি এখানে। ও চাকরিটা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়েছিলাম— স্বামী স্ত্রীর চাকরি করা পছন্দ করতেন না বলে।

রমেশদা বলেছিল আমার চাকরি করে দেবে। এ চাকরির আগের চাকরিটা রমেশদার চাকরি। সিমেন্টের জোচ্চুরির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওয়াদিয়ার কাছে গিয়েই সে চাকরির সূত্রপাত। ঠিকই আছে। কোন আপত্তি নেই কেননা আমার আর কোন প্রশ্নই নেই। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ওসব আর বুঝি না—আমি বুঝতে শিখলাম আমার সুবিধে আর অসুবিধে। এই চলত। ভালোই চলত। এর মধ্যে আবার তুমি কিছু কথা বললে—কেন বললে তুমিই জানো। আগেই বলেছি আবার বলছি তোমার কারণ তোমার কাছেই কিন্তু কথাগুলো আবার আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো। এই পুরনো ইচ্ছেটা নতুন করে মনের মধ্যে জেগে উঠল বলেই ওয়াদিয়ার কাছে যেতে আমি আর রাজি হচ্ছিলাম না। রমেশদা এটাকে আবদার বলবে তা জানা সত্ত্বেও। আশ্চর্যের ব্যাপার আমি যে মন নিয়ে বললাম—যাবো না ; তুমিও সেই মন নিয়ে হঠাৎ বললে—আচ্ছা, যেও না। এতটা আমি আশাই করিনি। কিন্তু রমেশদার কাছে আজ সব শুনলাম—না গেলে তোমারই বিপদ। বিশ্বাস করো আজ

আমি আমার নতুন মন নিয়েই বলছি—তোমার জন্যেই যাব। আজ আমার মনে হচ্ছে যে তুমিও বোধহয় জীবনে এই প্রথম সত্যি সত্যি নিজের মনের কাছে ধরা পড়লে। যে আচরণ তুমি ইদানীং আমার সঙ্গে শুরু করেছ তা তোমার স্বভাবসঙ্গত নয়। মানুষ যখন নিজের চরিত্রসম্মত আচরণ করে তার সুখ না থাক স্বস্তি থাকে তখন সে পথ থেকে সে বিচ্যুত হলেই তার আর স্বস্তি থাকে না। কেন তুমি তা করলে সে প্রশ্ন তোমার, আগেই বলেছি আবার বলছি, তুমি সবাইকেই ডুবিয়েছ বলে আমি তোমাকে ডোবাতে পারি না।
পয়লা জুলাই তোমার বাড়িতে সন্ধ্যেয় তুমি ওয়াদিয়াকে নিমন্ত্রণ করো। আমি আসব। ওয়াদিয়ার সঙ্গে দহিজুড়ির জঙ্গল বেড়িয়ে ওকে নিয়ে তোমার বাড়িতে আসবো। তারপর তোমার ওখানে কথাবার্তা শেষ হবে। ওর অনেক দিনের সখ। আমি যাব—কেননা তুমি আমায় নিয়ে সত্যিই তামাসা করছ না এটা যখন বুঝলাম তখন আর আমিও কিছু নিয়ে তামাসা করতে পারব না। আমার খেয়াল নিয়েও নয়। তোমার কাছে যা পেলাম কোথাও তার কোন মূল্য না থাকলেও তারি মূল্যে আমি নিজে এখন মূল্যবান—যে ভাবেই হোক না কেন সে মূল্যের হানি ঘটাতে কেউ পারবে না। ইতি—টুলু

২৬শে জুন—সন্ধ্যে

এইমাত্র বাবার ঘরে গিয়েছিলাম টুলুমাসির চিঠিটা রেখে আসতে। তারপর এখন বসে বসে চিঠিটার কথাই ভাবছি। টুলুমাসি আমার জীবনের শনি। এখনও টুলুমাসি আমাকে ছাড়বে না। 'তোমার কাছে যা পেলাম' (লাল মাইশোর সিল্কের শাড়ি আর চুমু?) কী পেয়েছে টুলুমাসি যার জন্যে এমনি করে অশ্রুনিলয়ের স্বপ্ন, মঞ্জুর সমস্ত মনখানা ভেঙে ভেঙে তুমি গুঁড়িয়ে দেবে 'কোথাও তার স্বীকৃতি না থাকলেও—'
হ্যাঁ মূল্য নেই, শুনে রাখ এক কানাকড়িও মূল্য নেই তার। টুলুমাসির চিঠিখানা বাবার ড্রয়ারেই রেখে দিয়েছি। খোলা ড্রয়ারটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম খানিকক্ষণ। সেই রবারের টুপি-লাগানো ছোট্ট শিশিটা এখন আমার টেবিলে। থাক এখন আমার ড্রয়ারে। ভালো করে চাবি দিয়ে চাবিটা লুকিয়ে রেখে দিলাম। কী অসম্ভব হাত কাঁপছিল কি বলব।

২৭শে জুন—

গোল ছোট্ট শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। এতটুকু শিশিটা এত সাংঘাতিক। আচ্ছা শিশিটা আমি কেন নিয়ে এলাম? শিশিটা বাবার ওখানেই বা ছিল কেন? কেন সে আর আমি ভাবতে পারি না। বাবার চিঠিটা পড়ে কেমন যেন ভয় ভয় করে। না—তাই কি? আর তাই যদি হবে, তবে আমি যা ভাবছি তাই হোক না কেন?

গোল ছোট্ট শিশিটা হাতের তালুতে রাখা যায়। হাত মুঠো করে ধরে রাখি ওটাকে। সুখদা গল্প বলত ছোটবেলায়—পরমাসুন্দরী মেয়ে বিজন বনের মধ্যে বসে কাঁদছিল, রাজার মনে দয়া হল তাই দেখে। তিনি তাকে নিয়ে এলেন রাজপুরীতে। সে কিন্তু মেয়ে নয়—সে রাক্ষুসী। দিনের বেলায় সে যেমন তেমন—রাতের বেলায় সে একটু একটু করে রাজপুরীর সমস্ত প্রাণ চুষে চুষে খেয়ে ফেলে। তারপর? একজন কে জানত যে রাক্ষুসীর প্রাণ আছে একটা ভোমরার মধ্যে। সেই ভোমরাটা হাতের তালুতে রেখে টিপে মেরে ফেললে রাক্ষুসী মরে যাবে।

এই ছোট্ট গোল শিশিটাকে নিয়েই আমার ভয়। যদি একে হারিয়ে ফেলি। তাই লুকিয়ে রেখেছি টেবিলের টানায়। চাবিটাও লুকিয়ে রাখি। কেউ যেন না দেখে। আমি যা ভাবছি ঠিকই তাই। বাবা যা ভাবছিল ঠিক নয়। এই ছোট্ট গোল শিশিটাকে আমি এখন প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। আরব্যোপন্যাসের গল্পে পড়েছি একটা ছোট কলসির মধ্যে একটা বিরাট দৈত্যকে পুরে রেখে দিয়েছিল কে। আমার এই ছোট্ট শিশিটাতেও তেমনি একটা বিরাট দৈত্য আছে। একে আমি ছেড়ে দোব না। বাবার কাছে একে যেতে দেওয়া হবে না। বাবা কী ভাবছিল? বাবা যা ভাবছিল তা কি সত্য আর বাবা ভাবছিল? ঐ রাক্ষুসীই ওকে ভাবাচ্ছিল। গোল শিশিটা রবারের টুপি পরা। টুপিটা খোলে কী করে····· কিন্তু কী সুন্দর দেখতে শিশিটা!

২৮শে জুন—

ভয়টাই বা কিসের, ভাবনাই বা কী? কেউ যদি আমার দিকে না তাকায়

আমারও কারো দিকে তাকাবার দরকার নেই। মায়ের ঘরে আর যাই না। বাবার দিকে তাকাই না। সুখদার সঙ্গে কথা বলি না। ইলু আসে না। অরুণদা সেদিনের পর আর আসেনি। এখন অনেক রাত। ঘুমও আসছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পায়ে পা ঘষছিলাম। আমার সমস্ত মন যেন বিষে জ্বলে গেছে। একটা গাছ ছিল আমাদের বাগানে। ছোট বেলায় ব্লেড দিয়ে তার শেকড় কেটে দিয়েছিলাম। শুকিয়ে কুঁকড়ে দিনে দিনে গাছটা মরে গিয়েছিল। কে সে নিষ্ঠুর যে আমার মনের শেকড় এমনি করে কেটে দিল।

ডায়েরির খাতাটা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখি। কেউ যদি দেখে ফেলে। কে দেখবে? মা তো পড়ে রয়েছে। বাবা এঘরে আসে না। তবে মাকেই ভয়। কী লিখিস রাতদিন—সুখদা বলছিল, মা কেবল জিজ্ঞাসা করে। বলি—ও কিছু না। আজ সকালে ডায়েরির খাতাটা আবার খানিকক্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খানিক বাদে আমার বালিশের তলায় পেলাম কিন্তু ওখানে তো আমি ওটা রাখিনি। কিছু ঠিক করে ভাবতে পারছি না। সারাদিন একা একা বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি। পাখিগুলো ফড়িং ধরে ধরে খেয়েছে দেখেছি, বেড়ালটা ওত পেতে থাকে, পাখি ধরতে যায় দেখেছি। দিনের শেষে ঝড় এসে জামরুল গাছের হাত মুচড়ে সমস্ত জামরুল কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে যেতে পারেনি। ফেলে ছড়িয়ে গেছে গাছতলায়। সন্ধ্যেবেলায় ঝড়ের সময় গাছ থেকে একটা পাখির বাসা খসে পড়লো ডাল ভেঙে। পাখিদের মা কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাগুলোর কাছে যেই উড়ে এসেছে অমনি সেই বেড়ালটা লাফ দিয়ে পাখিটাকে দাঁতে কামড়ে ধরল। পাখিদের মায়ের কান্না চিরকালের মত থেমে গেল।

খুব বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা হয়েছে চারিদিক। পৃথিবী জুড়োলো। শুধু জুড়োলো না আমার মাথাটা। কখনো কি জুড়োবে? পয়লা তারিখ রাত বারোটায় আমি এতক্ষণ কোথায়? কী করছি?

চাঁদটা ছুটে পালাচ্ছে বুড়োবুড়ি পাহাড়ের দিকে? ছুটছে কেন? ভয়ে? —না ছুটছে না। ভাঙা মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় চাঁদের পাশ দিয়ে। মনে হচ্ছে চাঁদ উড়ে পালাচ্ছে উল্টো দিকে। ভীষণ হাঁটু কাঁপছে। ভীষণ ভয় করছে—মায়ের কাছে একটু যাব?

(ডায়েরির এই অংশটুকুতে কোন তারিখ ছিল না। বস্তুতঃ ডায়েরির এ অংশটুকু আমরা ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পারি। সব কথাগুলোই কাটা-কাটা, অসংবদ্ধ, অগ্রথিত এবং কখনো কখনো অসমাপ্ত। অধিকাংশ কথাই লিখে লিখে কলম চালিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ভাবে এ কাজটা করা হয়েছে যে কোন মতেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া পাঠোদ্ধার করা গেলেও অর্থোদ্ধার করা যেত বলে মনে হয় না— সে কারণেই আমি আর সে চেষ্টা করিনি।)

জ্যাক কাম হিয়ার…জলি কাম হিয়ার · পারব না…লটারি ··আঙ্,ল ধরাব… ছেলেদের মত হেড টেল…হেড অর টেল·· পুড়ে গেলে রঙ কেমন হয়… দহিজুড়ির জঙ্গলের কালো পাথর…চুমু…অরুণদার থ.,তনিটা বিচ্ছিরি…ল্যাজ আছড়াচ্ছে টিকটিকি…পোকাটা ফসকে গেল…বাবা, টুলুমাসি মঞ্জু…বাবা মঞ্জু…বাবা মঞ্জু…বাবা মা মঞ্জু…বাবা মঞ্জু মা, না, বাবা মা মঞ্জু…চন্দনপুরী… গয়না…টুলুমাসি…ফের পোকাটা ফসকে গেল…হেড অর টেল…লটারি… রমলা যখন টুকছিল আমার…অরুণপ্রকাশ মৈত্র আর মঞ্জরী মৈত্র…সান্যাল… সোনার টোপর পরা পার্কার কলম…পার্কার ফিফটি ওয়ান…ফিফটি টু…থ্রি… ফোর ফাইভ……

বাবা মা টুলুমাসি মঞ্জু অরুণদা
or বাবা টুলুমাসি মঞ্জু অরুণদা
or বাবা টুলুমাসি মঞ্জু
or টুলুমাসি মঞ্জু
মঞ্জু, Ans

পুড়ে গেলে রঙ কালো হয়ে যায়…কী হবে…কিচ্ছু হবে না…অশ্রু…মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ…মাথাটা খসে যাচ্ছে·· একটা লাল ব্রণ…।

৩০শে জুন—

আর চব্বিশ ঘন্টা। কাল রাত্তির বারোটার সময় সব মিটে যাবে। বাবা তখন কি করবে? মা কি করবে? আমি তখন কোথায়? ওঃ মাগো একটু শব্দ হলেই কি ভীষণ বুক ধড়ফড় করছে। কাল বাগানে একটা বড়

বিছে বেরিয়েছিল। জুতোর হিল দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে মেরে ফেললাম সেটাকে। দুমড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে করতে মরে গেল—যেন বলছিল আর করব না, আর করব না কিন্তু তখন আর করব না বলে লাভ কি ? রামবিরিজ আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছিল। দাঁতে দাঁতে চেপে হাত মুঠো করে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

রাত্রে বিছেটাকে স্বপ্ন দেখলাম। যেন একটা মস্ত বড় দড়ি হয়ে দুটো দাঁড়া বাড়িয়ে দিয়েছে সে আমার গলার দিকে। আমাকে মেরে ফেলবে ? আমার গলায় সামনে কী বিশ্রীভাবে দুলছিল দড়িটা। ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম আমি। না, আমি নয়, আমি পারব না, না। আমি মরে গেলে মায়ের বড় কষ্ট হবে। তাছাড়া অরুণদা কি ভাববে ? তবু দড়িটা দুলছিল। আমি চেঁচিয়ে বলতে গেলাম—না আমি ফাঁসি যাবো না, আমি নয়।

দড়িটা জিজ্ঞাসা করল—তবে কে যাবে ?

বলে ফেললাম—সুখদা যাবে। ওর কেউ নেই, ও যাবে। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখনও ফ্রক পরেই শুই—কাপড় উঠে যায় বলে—দেখি সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।……

এখন বারোটা বাজল। এবার তিরিশে জুনের ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়ে ফেলব। এবার পয়লা জুলাই। টুলুমাসি, রমেশকাকু, ওয়াদিয়া সব আসবে। খাওয়া-দাওয়া হবে। ঢাউস ঢাউস গ্লাসগুলো সরবতে টইটম্বুর হবে। অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতলগুলো খালি করে দোব—আর—আর কিছু না। এবার পয়লা জুলাই। শুধু বিছেটার মত তুমি যেন আর করব না বলে বোস না তখন। আমার যেন আবার মায়া না হয় তখন।

১লা জুলাই --

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে যেন। কি রকম লাগছে যে শরীরটা বলে বোঝাতে পারব না, ঠিক যেন মনে হচ্ছে কোমর থেকে আর নেই নিচের দিকটা। এখন এইখানে বসে বসে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আর কিছু করার নেই, আর কোন রাস্তা নেই। এক একটা কানামাছি যেমন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বেরুতে পারে না আর যত বেরুতে যায় তত ধাক্কা খায় দেওয়ালে

আর মাটিতে পড়ে যায়—আমারও হয়েছে যেন তাই। আর আমার বেরুবার পথ নেই। এখন কী হবে আমি অনেকটা আন্দাজ করতে পারছি। কাকে বলি, কী করি, যদি অরুণদা আসতো তাহলে সব কি তাকে বলে ফেলতে পারতাম ? না তাও পারতাম না। সে কী ভাবত আমায় ! ভাবত কী ছোট মন আমার। না, না, সে ঠিক হত না, তার চেয়ে—

সকাল বেলায় রমেশকাকু এসেছিলেন। জানিয়ে গেছেন পিল্লাই-ই পেয়ে গেছে কণ্ট্রাক্টটা। ওয়াদিয়া পিল্লাইকেই দিয়েছে। কাজেই আর দরকার নেই আজ সন্ধ্যেবেলার জমায়েতের। কেন, পিল্লাইই পেল কেন ? ইঞ্জিনিয়ার সায়েব মিস্টার তরফদার কড়া নোট দিয়েছেন নাকি বাবা আর রমেশকাকুদের কাজের গলতি দেখিয়ে। ওঁর বুঝি প্রমোশন হবার কথা সেইজন্যে এখন কোন ঝামেলার মধ্যে থাকতে পারবেন না বলে দিয়েছেন, তাছাড়া পণ্ডিতজি সবাইকে সৎ হতে বলেছেন সেটাও একটা কথা বটে। আমার অবশ্য সবই শোনা কথা। সেই কারণে বাবাদের এবারের কাজ জোটেনি। আর পিল্লাইয়ের হয়েছে এই কারণে যে সে নাকি ওয়াদিয়াকে রমেশকাকুদের চেয়েও খুশি করে দিয়েছে। কে জানে কেমন করে—রমেশকাকু এমনভাবে কথা বলছিল যেন সব দোষই বাবার। বাবা চুপ করে সব শুনছিল। সব কথা শোনা হয়ে গেলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—যাক্ তাহলে ওয়াদিয়ার কাছে যাওয়ার আর দরকার নেই ?

রমেশকাকু বললেন—না।

—এবার এখানকার পাট গুটিয়ে ফেলতে হবে রমেশ ?

-পিল্লাই সমস্ত বিল্ডিংটারই ফাউণ্ডেশন টেস্ট করাবে।

—ঠিক আছে, যাও তুমি। টুলুকে ডেকে দিও একবার।

রমেশকাকু চলে গেল। বাবা চুপ করে বাবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবার মুখ চোখের দিকে তাকাতে পারা যাচ্ছে না। কী হবে ফাউণ্ডেশন টেস্ট করালে ? বাবা অমন করছে কেন ? দরজা খুলে বাবা একবার মায়ের ঘরে এলেন। পর্দা সরিয়ে খাটের কাছে এসে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা। বাবা যেন অনেক দিন ঘুমোননি। মা কিন্তু বাবার দিকে তাকালই না। সেই সাদা দেওয়ালটার দিকে রোগা শুকনো মুখখানা ফিরিয়ে বসে রইল। মা ফিরে তাকাবে না বুঝতে পেরে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবার নিজের ঘরে

গিয়ে ঢুকলেন। দরজা দেওয়ার শব্দ পেলাম। আর ঠিক সেইসময় আমার মনে পড়ে গেল সেই ভয়ংকর চিঠিটার কথা। ভয়ে আমার পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। তারপরেই মনে পড়ল, না, ভয় নেই—শিশিটা তো আমার কাছে। সব চুকে গেল। শিশিটা আর কোন কাজে লাগবে না আমার, এই কথা ভাবতে ভাবতে ড্রয়ারটা খুললাম। শিশিটা নেই! আমার পা থেকে কী একটা ঠাণ্ডা মতন যেন ওপরে উঠতে চাইছে। শিশিটা নেই! আমার মাথাটা টলছে। কাকেও তো জিজ্ঞাসা করা যাবে না। কী হবে?

১লা জুলাই, রাত ৯টা

বাবা সেই থেকেই গুম হয়ে রয়েছে। আমি দু-বার কথা বলতে গিয়েছিলাম, বাবা বলেছে, এখন যাও। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার কী করা উচিত? কাউকে কিছু বলা উচিত? তাও বুঝতে পারছি না। মা বোধ হয় একবার বাবাকে ডাকলে ভালো করত। মায়ের কাছে গেলাম। মা আমার সঙ্গেও কথা বলল না। আমিও ডাকলাম না আর। আমার দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল মা। চুপ করে বসে আছি এখানে নিচের বারান্দায়। বাবা বাগানে পায়চারি করছে। একটু আগে টুলুমাসি এসেছিল। বাবা আর টুলুমাসি বাগানে কথা বলছিল এতক্ষণ। আমি শুনেছি সব কথা কামিনীঝাড়ের পাশ থেকে।

বাবা বলছিলেন—এ এক রকম ভালোই হয়েছে টুলু। তুমি অন্তত অসম্মানের হাত থেকে বেঁচে গেলে।

টুলুমাসি একটুখানি হেসে বলল—তাহলে তো বাঁচাই যেত। কিন্তু দুটো খবর আছে যা তুমি জানো না।

বাবা চুপ করে রইলেন। টুলুমাসি বলল—কাল দহিজুড়িতে বেড়াতে যেতে হয়েছিল আমাকে।

বাবা বললেন—সে কী!

—হ্যাঁ এবং আরো আছে। রমেশদা পিল্লাইয়ের সঙ্গে তার আগে থেকেই দহরম মহরম শুরু করেছে। এখন পিল্লাই আর রমেশদা একজোটের লোক। আমাকে সে কথাটা জানানো হয়নি। কাজেই আমি নির্বোধের মত ভেবেছি

যে তোমার মুখ চেয়েই যা করবার আমি করছি। আজ সকালে সব জানলাম। জানলাম কী দারুণভাবে ঠকেছি। আমি তুমি সকলেই।

ওই অবধি শুনে আমি উঠে চলে এসেছি। এখানে এসে বসে আছি। আর কিছু ভালো লাগছে না। কী করব বসে বসে এই ডায়েরির খাতাটা উল্টে উল্টে পড়ছিলাম এতক্ষণ। গরমের ছুটির বড় বড় দিনগুলো কেটে গেল। আমার মনের জ্বালার কথা, আমার ভালবাসার কথা, সব কিছুরই কথা এ খাতার পাতায় লেখা আছে। কী চেয়েছিলাম, কী পেলাম মা। মায়ের কথা, বাবার কথা, টুলুমাসির কথা, অরুণদার, ইলুর সকলের কথাই লেখা আছে এখানে। পড়তে পড়তে মনটা কেমন অদ্ভুত হালকা হয়ে গেল। এখন এক্ষুনি আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এ ক-দিন অনেক ভেবেছি। আমার কাউকেই ভালো বা খারাপ কিছুই মনে হচ্ছে না। এখন আমার কারুর ওপর ভালবাসাও নেই রাগও নেই। ঐ যে ওখানে বসে আছে টুলুমাসি মাটির পুতুলের মত স্থির হয়ে—এখন ঐ টুলুমাসিটার মতই আমার অবস্থা। হারিয়ে ফেলেছি শিশিটা —টুলুমাসি বেঁচে গেল। ভালো হল না খারাপ হল সেকথাও আমি আর ভাবতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে আমি কেন করতে গিয়েছিলাম ও কাজ, কেন? কার জন্যে? মার জন্যে? বাবার জন্যে? নাকি নিজের মনের ঝাল মেটাতে। যাই হোক হয়নি কাজটা, আমি পারিনি আমি পারিনি। সন্ধ্যেবেলার ফুরফুরে হাওয়ায় জামরুল গাছ দুলছে। এক ঝাঁক বেলফুলের গন্ধ বাগানে। দূরে কটা সাঁওতাল মেয়ে কী গান গাইতে গাইতে কারখানা থেকে কাজ করে ফিরে যাচ্ছে। রূপসাডিহির ঘরে ঘরে আমার বন্ধুরা এখন পড়তে বসেছে। ইলু হয়তো একটু একটু আমার কথা ভাবছে পড়তে পড়তে। আমি বসে আছি। আর আমার সামনে কোন কাজ নেই। বাবার যা মন চায় করুন। টুলুমাসি যা মন চায় করুক। আমি কী করতে পারি? আমি তো সব গোলমাল শেষ করেই দিচ্ছিলাম। পারলাম কি? কেউ কিছু পারে না। তা না হলে বাবাকে টুলুমাসি বশ করতে পারে? কারুর হাতে কোন ব্যাপার নেই। আর আর আমি কিছু ভাবব না। বাবা টুলুমাসিকে চুমু খান, অরুণদা আমাকে চুমু না খাক, আমি কিছু নিয়েই আর দুঃখু করব না, ইলু কথা না বলুক, ক্লাসের মেয়েরা আমাকে আঙুল দেখাক—কিছু আসে যায় না। শুধু মায়ের কাছে

বসে থাকব চুপ করে। এখন ইস্কুলে যাবো না দিনকতক। মায়ের বুকে মাথা গুজে বসে থাকব। আমার সমস্ত মনে কে যেন বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। এবার সে বিষ আমি ফেলে দোব।

বাড়িটা থমথম করছে। রামবিরিজ চুপ করে বসে আছে ওর খাটিয়ায়। আজ আর ও বোধ হয় রামায়ণ পড়বে না। বলবে না, বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাওয়া। এইবার আমার ঘুম পাচ্ছে। টুলুমাসি চলে গেল। বাবা গেট অবধি পৌঁছে দিচ্ছে টুলুমাসিকে। ঘুম আয়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে আমার। মনে পড়ছে চন্দনপুরীর সেই দু-কুঠুরি বাসা। মায়ের কোলের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বিষের শিশিটার কথা। জ্যাক কুকুরের কথা, দূরের সাঁওতাল মেয়েদের গানের সুর শুনতে পাচ্ছি। আজ দু-দিন ভালো করে ঘুমোইনি। ঘুমপাড়ানি গান শুনতে ইচ্ছে করছে বড়—

ক্রিং- ং- ং করে মায়ে ঘরে কলিং বেলটা বেজেই থেমে গেল। যাই এবার ঘরে যাই। আর লেখার কিছু নেই—করার কিছু নেই—গুড নাইট টুলুমাসি, টা—টা। সুখদা কোথায়, সুখদা দাদাবাবু-দাদাবাবু করে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে। কী হল, কী ? সুখদা চেঁচাচ্ছে ফের—রামবিরিজ !

আওয়াজটা কেমন সামনের বাড়ির পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছে --বিরিজ বলে সাড়া দিচ্ছে—এতদিন লক্ষ্য করিনি তো। বাবু কোথায়—আয় বলে সাড়া দিচ্ছে পাঁচিলটা যেন ভেঙাচ্ছে। মাইজি······ডাক্তারবাবুকে······কী বলছে ওরা। বাবা ছুটছে কেন ?—হঠাৎ কেমন যেন ভীষণ ভয় করছে। আমি উঠতে পারছি না আর। কিছু লিখতে পারছি না আর। তবে তবে কী······আমি একবার বাথরুমে যাব।

মায়ের চিঠি

মঞ্জু,

অবাধ্যতা আর একগুঁয়েপনা তোমার মহৎ দোষ। দেখ ভিজে চুলে শুতে তোমায় কতদিন বারণ করেছি, সুখদা বলছিল পরশু সারাদিনে তুমি চুল শুকোওনি তারপর বিকেলে আবার মাথায় জল দিয়েছিলে। কথা তুমি

শোন না একেবারে। যাই হোক এই চিঠিখানা আমি তোমার জন্য লিখছি। একখানা চিঠি তোমার বাবাকে দিলাম। আমার মৃত্যুর দায় আমার—সে কথা জানিয়ে দিয়েছি সে চিঠিতে। এ চিঠিখানা তিরস্কারের চিঠি। আমি তোমার মা। তোমাকে আমার শেষ তিরস্কারের চিঠি এটা। সুখদাকে দিয়ে তোমার দেরাজ থেকে ডায়েরির খাতাখানা আনিয়ে আমি পড়েছি। তারপর তাকে দিয়ে তোমার সংগ্রহ করা গোল ছোট্ট শিশিটা আমি এনে রেখেছি। এই চিঠিটা লিখতে লিখতেও আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি মঞ্জু যে, তোমার ঐটুকু বুকে এত বিষ কে দিল। তোমার ডায়েরি পড়তে পড়তে তোমার মনের চেহারাটা আমার কাছে ধরা পড়ল। টুলুর ওপর তোমার যত ক্রোধ থাকুক না কেন তুমি বিষ ব্যবহার করে সে ক্রোধের জ্বালা মেটাবে? তুমি কতটুকু মঞ্জু, বিষ তুমি কতটুকু চেন? তুমি কি জানো টুলুর সরবতে বিষ মেশাবার অনেক আগে তুমি বিষ মিশিয়ে বসে আছ তোমার মনে। টুলু মরে যেতে পারত, তুমি এই ভেবে খুশি হতে যে বাবাকে আবার ফেরত পেলে তোমার সংসারে—কিন্তু ঐ বিষের জ্বালায় আমরণ জ্বলতে তুমি—কী দিয়ে তার উপশম ঘটাতে? একটা কথা মনে রেখো যে এ সংসারে যা কিছু আমাকে করতে হয় সবই তোমার মুখ চেয়ে। তুমিই আমার অস্তিত্ব, তুমিই আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তোমার ছোটবেলায় ঘুষ দেওয়ার জন্য তোমার বাবা একবার আমার গয়নাগুলো চেয়েছিলেন। প্রথমে যে দেব না বলেছিলাম সে তোমারি মুখ চেয়ে। পরে যে দিয়েছিলাম সেও তোমারি ভবিষ্যৎ ভেবে। তাই তোমার কাছে আমি সবসময় লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি তোমার বাবার আর আমার বর্তমান সম্পর্ক। তোমার বাবার কল্যাণে সিঁদুর পরতে আমার ইচ্ছে করত না, তবু পাছে তুমি কিছু বুঝতে পার তাই তোমাকে কখনো না করিনি। কিন্তু তোমার ডায়েরি পড়ে আমার মনে হল যে যে ভয়ে আমি গত এক বছর ধরে সিঁটিয়ে আছি সেই ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়েছে। টুলু, তোমার বাবা অথবা আমি অশ্রুনিলয়ে গত এক বছর ধরে যে পালা গাইছি, আমার বড় ভয় ছিল যে সে পালায় হঠাৎ কোন ফাঁকে তুমি না যোগ দিয়ে ফেল। দহিজুড়ির জঙ্গল থেকে তুমি যেদিন একলা ফিরলে সে দিনই বুঝেছিলাম যে তাই

হতে চলেছে—রামবিরিজ বলে যেদিন তুমি চেঁচিয়ে উঠলে সিঁড়ির মোড়ে—সুখদা বলল, টুলুদি আর দাদাবাবু কথা বলছে ওখানে সেই দিনই বুঝলাম তুমি এক অথৈ ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছ। তারপর থেকে আমিও পথ খুঁজতে লাগলাম। তোমার ডায়েরির মধ্যেই পথের ইঙ্গিত ছিল। মনে রেখো মঞ্জু আর কাউকে বাঁচানোর জন্যে নয় তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই আমাকে একাজ করতে হল।

তোমার বাবার জন্যে সত্যই আমার মায়া হয়। পিল্লাইকে হারাতে হবে, পিল্লাইকে হারাতে হবে—জীবনটা এই করেই ভদ্রলোক হারিয়ে বসে আছে। ভয়ে ভয়েই লোকটা গেল যেন—পিল্লাই না জেতে। আমাদের ভদ্রলোকেরা সেই কথামালার কৃপণের গল্পের কৃপণ। সোনার তাল আগলে রেখেছি মনে করে আমরা পাথরের টুকরো পাহারা দিই। তোমার বাবা বেশি আঁকড়ে ধরতে গেছে সব কিছুই, কোন্ ফাঁকে সব কিছুই যে চলে গেছে তা জানে না। আমি জানি আর তুমিও জেনে রেখো যে জীবনটা নাটক নভেল নয়। সুতরাং সাধারণ নভেলিপনা করে আমি এ কাজ করছি না। বাস্তবিক, এ ছাড়া আর রাস্তা নেই। তোমার ডায়েরি পড়ে আমি বুঝলাম যে তোমাদের সংসারে এখন একটা আঘাত দরকার যে আঘাতে তোমার বাবা আত্মস্থ হবেন, তুমি সচেতন হবে, টুলু ফিরে যাবে। এ আঘাতটা আমারই দেওয়া দরকার। এভাবে ছাড়া আমি আর কী ভাবে দোব সে আঘাত। আর তা ছাড়া ঘৃণা করে করে একটা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে হয়তো। কিন্তু যখন তার ঘৃণাটাও হারিয়ে যায় হঠাৎ আর ভালবাসাও নেই অনেক দিন তখন সে কী করবে।

তোমার ডায়েরি না পড়া পর্যন্ত আমি শুধু ঘৃণাই করেছি। তোমার বাবাকে আর টুলুকে। এখানে রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে আমি আমার চোখে যা দেখেছি তা কতকটা তোমার মুখ চেয়ে দেখা। তুমি ছোট মেয়ের চোখে দেখেছ সব ঠিক—বুঝেছ সব ভুল। আজ যখন ঠিক করে সব বুঝলাম তখন আমার মায়া হচ্ছে টুলুর ওপর, মায়া হচ্ছে তোমার বাবার ওপর, ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে।

টুলুর চিঠি যেটা তুমি কপি করে রেখেছ সেটা পড়ে টুলুকে বুঝলাম,

তোমার বাবার অসমাপ্ত চিঠি পড়ে তোমার বাবাকে বুঝলাম। আর তোমার ওপর তার প্রতিক্রিয়া বুঝলাম তোমারই লেখায়। এখন আমি আর কাউকেই ঘৃণা করতে পারছি না। তবু আমি মা বলেই এ তো কিছুতেই সহ্য করতে পারি না মঞ্জু যে তোমার মন এমনি করে বিষের জ্বালায় জ্বলবে। তাই সমস্ত বিষের জ্বালা আমি আমার বুকেই তুলে নিলাম, এছাড়া আর পথ ছিল না।

শোক কেটে যাবে। শোক চিরস্থায়ী নয় তাহলেও আমার কথা ভুলতে পারবে না কখনও। এই চিঠিখানা মাঝে মাঝে পড়ো। সব কথা হয়তো আজ বুঝতে পারবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে পারবে। জ্যাক বলে যে কুকুরটা ছিল এ বাড়িতে, লোম উঠে ঘা হয়ে যেটা মরে গেল, তোমার মনে নেই মরবার সময় সেই ঘেয়ো কুকুরটারও চোখের জল দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেও জীবনকে ভালবাসত। জীবন সুন্দর মঞ্জু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু আমরা তাকে লুব্ধের মত আঁকড়ে ধরতে গেলে দেখব জীবনের সোনা সিসে হয়ে গিয়েছে। তোমার বাবা তাই করলেন। তারপর যখন টুলু এসে দাঁড়াল তাঁর জীবনে তখন সেই সিসেকে সোনা করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আজ আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে সেদিনের কথা যে দিন আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আমার পেটে এসেছ, সেদিন খুব ভয় ভয় করছিল আর আনন্দ হয়েছিল। আজ শুধু ভয় ভয় করছে মনটা। শেষ অবধি পারবো কিনা বুঝতে পারছি না। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—মা

২রা অগস্ট—

মায়ের চিঠিটা হাতে করে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। কোথা থেকে জানি না অশ্রুনিলয়ে যে বিষটুকু এসে জমা হয়েছিল সে রাত্রে আমার মা সে বিষের সমস্তটা নিজে শুষে নিয়ে চলে গেছে। আমি ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে পারিনি তখন। মা খানিকক্ষণ ছটফট করে—নিজেই দু-বার ডাক্তার ডাকার কথা বলে ডাক্তার আসার আগেই চোখ বুজে শেষ হয়ে গেল, দুখানা চিঠি মা লিখে রেখে গেছে। একখানা বাবাকে। তাতে শুধু

লেখা—'আমি নিজেকে নিজেই শেষ করলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' আর এই চিঠিটা আমাকে লেখা—এ চিঠিটা এ ডায়েরি খাতার মধ্যেই রেখে দিয়েছি।

প্রথমে ভেবেছিলাম আমার কত কিছু হবে - কিন্তু কিছু হয়নি। আমি ভেবেছিলাম আমি অজ্ঞান হয়ে যাব, যাইনি। ভেবেছিলাম যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যাবে, গেল না। ভেবেছি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাব—না, কিছু হয়নি। সেদিন কান্নাই আসেনি চোখে। তারপর তো কান্নার জন্য একটু ফাঁকই ছিল না। শাহারানপুর থেকে কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবাসী সবাই মিলে আমাকে এত বুঝ দিতে লাগল যে কোন দিকেই আর হাঁফ ছাড়বার সময় ছিল না আমার। আজ এত দিন বাদে বাড়ি ফাঁকা। কাকা-কাকিমা তাঁর ছেলেমেয়ে সব চলে গেছেন। আমি আছি আর বাবা আছেন বাড়িতে। আজ দুপুর বেলা একা একা বাগানে বসে যেন আশ মিটিয়ে কেঁদেছি। মায়ের ঘরটা এখন ফাঁকা। সে ঘরের সমস্ত ফার্নিচার বার করে নেওয়া হয়েছে। শুধু দেওয়ালে রয়েছে সেই দহিজুড়ির জঙ্গলে টিলার ধারের ছবিটা।

আমরা চলে যাব। শাহারানপুরে কাকিমার কাছে গিয়ে থাকব আমি। বাবা চলে যাবে কলকাতায়। ওখানে নতুন করে কী একটা কাজ শুরু করবে বাবা। টুলুমাসির এখানে চাকরি হয়েছে—কারখানার আপিসে। বাবা মাঝে মাঝে টেবিলে হাত রেখে হাতের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকে। কী ভাবে কে জানে। বাবা কি টুলুমাসির কথা ভাবে, না কী মায়ের কথা ভাবে? কে জানে কী ভাবে। হয়তো সবকিছুই ভাবে। এর মধ্যে বাবার সঙ্গে আর আমার বিশেষ কোন কথাবার্তা হয়নি। সে দিন রাত্রে চুপি চুপি বাবার ঘরে বাবা কী করছে দেখতে গিয়েছিলাম। বাবা অমনি করে বসেছিল। একবার মনে হল যাই বাবার কাছে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদি। কিন্তু যেতে পারলাম না, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল—না দরকার নেই। যদি বাবা কেঁদে ফেলে। কত কথা জমে রয়েছে, কত কথা, কত ভাবনা। মনে পড়ছে চন্দন-পুরীর বাসার কথা। মায়ের সেই দু-কুঠুরি সংসার। কাঁঠালকাঠের চৌকি।

'মা বাবা মনজু,' কিম্বা 'মা মনজু বাবা' বেশির ভাগ দিনই 'মা বাবামনজু'। নিচের ঘরে যেখানে পুরনো জিনিসগুলো আছে সে ঘরে আজ সারা সকাল কাটিয়েছি। আমার ছোটবেলার সবকিছুই এখানে ফেলে যেতে হবে।

সব-সব কথা মনে পড়ছে। আরো কত কথা এখানকার পরে মনে পড়বে আমার। কত কী আমি এখানে দেখলাম। কত কী ঘটল। চলে যাব এখান থেকে। দশ বছর বয়সে এখানে এসেছিলাম। এবারে যাব। ইলু, কৌশল্যা, পলাশের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। সকলের কথাই আমার মনে থাকবে? সকলের থেকে বেশি মনে পড়বে অরুণদার কথা। বাবার অবস্থা পড়ে গেল এখন। বাবাও এখান থেকে চলল। আমি চললাম শাহারানপুরে। অরুণদা অনেক বড় হবে, বিলেত যাবে, তার আর কি আমার কথা মনে থাকবে? থাকলেও আমি জানি সে থাকার কোন মানে হবে না। মা বেঁচে ছিল, কাছে ছিল, তাতেও বাবা মায়ের কথা মনে করে রাখতে পারেনি। সে জায়গায় আমি তো কত দূরে চলে যাব। সব পুরুষ মানুষই সমান। চোখের বার হলেই মনের বার হয়ে যাব। তবু রান্নাঘরের পেছনে সেই গোলাপ বাগানে বসে বসে বিজন দুপুরে আজ আমি মনের সুখে কেঁদেছি। এ বাড়িতে আমার ছিল অনেক কিছু, খোয়া গেল অনেক কিছু যা আমি আর কখনো পাব না।

দেখতে দেখতে আমার ছেলেবেলা যেন কেটে গেল। আমি বড় হয়ে গেলাম।